পঞ্চবটী।

[অথবা গল্প-পঞ্চক।]

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

পিপেলস প্রেস।

মূল্য ১॥০ একটাকা আট আনা।

২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মের ছুটী ফুরাইয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্র অপরাহ্নে পাঠাগারে কৌচের উপর শুইয়া এক খানি পুস্তক দেখিতেছেন। দূরে বসিয়া ভার্য্যা সুকুমারী সজলনেত্রে প্রবাসগমনোদ্যত স্বামীর জন্য একে একে পুস্তকগুলি গুছাইতেছে।

সুকুমারী বালিকা। বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। ইহারই মধ্যে সে অশেষ গুণে গুণবতী। সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ভক্তি, অনন্ত ভালবাসা। নির্ম্মলচন্দ্র পত্নীকে কিছু কিছু ইংরাজি শিখাইয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে পিত্রালয়ে সুকুমারী বেশ বাঙ্গলা শিখিয়াছিল। বালিকা সেই অসংখ্য পুস্তকরাশির মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া স্বামীর পাঠোপযোগী পুস্তকগুলি গুছাইতেছিল।

একখানি, দুই খানি—পাঁচ খানি—আর বালিকা পারিল না। ফোটা ফোটা করিয়া চক্ষের জলে কপোল, বক্ষঃ, হস্ত, হস্তস্থিত পুস্তক সমস্ত প্লাবিত হইতে লাগিল। তাহা দূরে রাখিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বালিকা উঠিল। উঠিয়া স্বামীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তাঁহার হস্তের পুস্তক সমভাবেই উন্মুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু দৃষ্টি তাহার উপর নাই। চক্ষু জলে ভাসিতেছে, সে চক্ষের জলে পুস্তক ভিজিতেছে। বালিকা ইহা

দেখিল। দেখিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার চক্ষের জল মুছিয়া, স্বামীর হস্ত হইতে সে পুস্তকখানি কাড়িয়া লইল। বলিল—"কাঁদিতেছ কেন ?"

নির্ম্মল কিছুই উত্তর করিল না। তখনও তাহার চিত্ত শান্ত হয় নাই। তখন, বালিকা ধীরে ধীরে স্বামীর পাশে গিয়া বসিল। বলিল—"ছিঃ কাঁদিতে আছে কি ?" বালিকা আদর করিয়া তাহার দাড়ি ধরিয়া নাড়িল।

নির্ম্মল কথা কহিল না, অতৃপ্তলোচনে বালিকার সেই ঢল ঢল মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল।

তখন ৫টা বাজিয়াছিল, সূর্য্য ডুবিয়া আসিতেছিল। সেই অপরাহ্ন-সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ আসিয়া বালিকার আলুলায়িত কেশরাশির উপর পড়িয়া খেলা করিতেছিল। সেই সুন্দর, পরিষ্কার, মধুর মুখচ্ছবির উপর উজ্জ্বল সূর্য্যালোক পড়িয়া "উজ্জলে মধুরে" মিলিতেছিল। সেই উজ্জ্বল মধুর আলোকে সেই আয়ত, বিস্ফারিত, লীলাচঞ্চল চক্ষু—যে চক্ষু প্রতি চাহনিতে বলিতেছে আমি তোমারই—তোমা ভিন্ন এ জগতে আমার কেহ নাই—যে চক্ষু পলকে পলকে ফাটিতে চাহিতেছে, অথচ কি জানি কি সঙ্কোচে ফাটিয়া উঠিতে পারিতেছে না—সেই চক্ষু বিদ্যুদ্বারিগর্ভ মেঘের ন্যায় প্রেমভিক্ষা-পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে উজলিতেছে। নির্ম্মল এ সকল দেখিল। দ্বিগুণবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইল।

বালিকা আবার বলিল—"ছিঃ তোমার কিসের দুঃখ, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?

"কিসের দুঃখ!" নির্ম্মল কথা কহিল—"কিসের দুঃখ, সুকুমারি, তাহা কি তুমি জান না!"

বালিকা কাঁদিল। বলিল—"জানি, কিন্তু তাহার জন্য কাঁদিলে কি হইবে ?'

"কাঁদিয়া যদি কি হইবে, তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন, সুকুমারি ?"

"আমি পোড়ারমুখী তাই কাঁদিয়াছি—আর কাঁদিব না।

"ছিঃ ও কথা বলিও না। তুমি আমার সোণামুখী। যথার্থই বটে আমার কিসের দুঃখ! যে একবার এ সোণামুখ দেখিয়াছে এ জগৎ-সংসারে তাহার কিসের দুঃখ ? তুমি চুপ কর, সুকুমারি, আমি আর কাঁদিব না।"

"সত্য বলিতেছ ?"

"সত্য বলিতেছি।"

"তবে, আবার কবে আসিবে ?"

"এখনত আর ছুটি নাই, পূজার বন্ধে আসিব।"

"আসিবে ? ভুলিবে না তো ?"

"ভুলিব !—কি বলিলে, সুকুমারি, ভুলিব !"

"কি জানি, শুনিয়াছি কলিকাতা নাকি আজব সহর। সেখানকার মাগীরা সব কি মন্ত্র জানে তোমার মত সুপুরুষ দেখিলেই ভেড়া বানাইয়া ফেলে।"—নির্ম্মলের কথায় বাধা দিয়া ধীরে ধীরে এই কয়টি কথা বলিয়া বালিকা একটু হাসিল।

সে হাসির জ্যোৎস্না গিয়া নির্ম্মলের নির্ম্মল হৃদয়ে খেলিল। নির্ম্মল বলিল—"সে ভয় তোমার নাই। যে একবার এ মুখ দেখিয়া মজিয়াছে তাহাকে আর কেহই ভেড়া করিতে পারিবে না।" আদরে নির্ম্মল বালিকার মুখ চুম্বন করিল। প্রেমিকে প্রেমিকের কথা বুঝিল, তাই নির্ম্মল বালিকার মুখ চুম্বন করিল।

বালিকা হাসিল। নির্ম্মল যে তাহারই—নির্ম্মল তাহার ছাড়া আর কাহারো নয়, কাহারো কখনও হইবে না—বালিকা তাহা জানিত। নির্ম্মলের নির্ম্মল হৃদয়, নির্ম্মল চরিত্রের উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আপনার অস্তিত্বে যত বিশ্বাস নির্ম্মলের চরিত্রের উপর তাহার ততদূর বিশ্বাস। বালিকা আর কিছু বলিতে পারিল না, মধুমুখে মধুহাসি হাসিল।

"ঠাকৃরুণ বুঝি ডাকিতেছেন"—বালিকা আর কিছু বলিল না—আর সেখানে দাঁড়াইল না, মূহূর্ত্তমধ্যে তড়িৎবেগে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * *

তার পর, সেই রাত্রে যখন ৯টা বাজিল, ধীরে ধীরে একখানি গাড়ী আসিয়া বহির্দরজায় লাগিল। বহুদিনের সরকার ভগবান দাস বাহিরে বসিয়া নূতন খাতায় জমা খরচ কাটিতেছিল, তাড়াতাড়ি কলম রাখিয়া ভিতরে গিয়া বাবুকে সংবাদ দিল। বাবুর আদেশক্রমে, অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া, বাক্স, ব্যাগ, গাটরি একে একে লইয়া আসিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। কোন ভৃত্যদ্বারা তুলাইয়া দিতে মন সরিল না, কি জানি সে যদি দুইটা আবশ্যকীয় জিনিষ দিতে ভুল করে।

তখন, নির্ম্মলচন্দ্র মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে একবার শয়ন-গৃহে গমন করিল। কিন্তু যে জন্য তথায় গেল তাহা সিদ্ধ হইল না। নির্ম্মল আপনার পাঠাগার অন্বেষণ করিল, তথাপি সুকুমারীর সাক্ষাৎ মিলিল না। শূন্যমনে বাহিরে আসিয়া গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইল। একবার চারিদিকে শূন্যদৃষ্টে চাহিল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, সেই জ্যোৎস্নালোকে দেখিল—ছাদের উপর নীরবে, নিস্পন্দ ভাবে একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া—বিষাদময়ী সুকুমারী-মূর্ত্তি!

একবিন্দু—একবিন্দু অশ্রু মুছিয়া নির্ম্মল গাড়ীতে উঠিল। ঘর্ঘর শব্দে গাড়ী বেগে ছুটিয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চব্বিশ পরগণার মধ্যে কাঞ্চনপুর অতি সামান্য গ্রাম। সেই সামান্য গ্রামে এক সামান্য জমিদার ছিলেন। সামান্য হইলেও সে জমিদারের নজর সামান্য ছিল না। কলিকাতার রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর-দিগের ন্যায় তাঁহার নাম কখনও সংবাদপত্রে শোভা পায় নাই বটে, দরবার বা লেভীতে তাঁহার নাম কখনও অঘোষিত হয় নাই বটে, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সকল লোকেই তাঁহাকে জানিত। তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও পরোপকার গুণে বশীভূত হইয়া অনেকে প্রাতে উঠিয়া সে প্রাতঃস্মরণীয় নাম উচ্চারণ করিত। কিন্তু কবে কয়জন ভাল লোক এ পাপ পৃথিবীতে স্থান পাইয়াছে? অকস্মাৎ বৃদ্ধ জ্বররোগে তনু ত্যাগ করিলেন। চারিদিকে সমস্ত এজামণ্ডলে হাহাকার পড়িয়া গেল।

পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র বাড়ী আসিয়াছিলেন। কয়দিবস দিনরাত্রি ধরিয়া, অনাহার অনিদ্রায় যার পর নাই সেবা সুশ্রূষা করিয়াছিলেন। শেষ, পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন করিলেন। যথা সময়ে ঘটার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। কিছুদিন পরে, শোকের প্রথম বেগ শান্ত হইলে, ভগবান আসিয়া একদিন প্রাতে নির্ম্মলচন্দ্রকে তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত জমিদারির আয় ব্যয় বুঝাইতে বসিলেন। ভগবানের উপর নির্ম্মলের অসীম বিশ্বাস—ভগবান থাকিতে তাঁহার এ সব বিষয় দেখিবার প্রয়োজন কি?—নির্ম্মল কিছুতেই সে হিসাব দেখিতে চাহিলেন না। ভগবান শেষ বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া নির্ম্মল বলিলেন—"ভগবান, তুমিও কি পিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে

ছাড়িয়া যাইবে স্থির করিয়াছ?" ভগবান দেখিল, নির্ম্মলের কণ্ঠ বাষ্পবিকৃত। নিঃশব্দে কোঁচার কাপড়ে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কাগজপত্র বগলে করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তার পর, সে সমস্ত দিন ধরিয়া আপনার ঘরের খিল আঁটিয়া অচিরমৃত মনিবের জন্য বড় কান্নাই কাঁদিল। সমস্ত দিন সে স্নানাহার করিল না।

গৃহে অন্য অভিভাবক আর ছিল না, নির্ম্মলচন্দ্র তাহাতে বড় একটা ভাবিত হইল না। কারণ, নির্ম্মল জানিত, তাহার মাতা পাকা গৃহিণী, আর ভগবানের ন্যায় বিশ্বাসী ও প্রভুপরায়ণ ভৃত্য দুর্লভ। তাহাদিগের হস্তে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নির্ম্মল কলিকাতায় গেল। কলিকাতার কলেজে নির্ম্মল বি এ পড়িত। পিতার মৃত্যুর পর মধ্যে মধ্যে ছুটী পাইলেই বাটী যাইত। মাতার সেই অপার স্নেহ, পত্নীর সেই অপরিমেয় ভালবাসা—নির্ম্মলের প্রতি শনিবারে বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু তখন রেলের এমন সুব্যবস্থা হয় নাই। কলিকাতা হইতে কাঞ্চনপুর হাঁটিয়া যাইতে দেড় দিন লাগে। ডাকের পাল্কিতে গেলেও এক দিনের কমে হয় না। কাজেই অধিক ছুটী না পাইলে গৃহে যাওয়া ঘটিত না। গ্রীষ্ম কালে কলেজ একমাস বন্ধ, সেই একমাস নির্ম্মল গৃহে ছিল। ছুটী ফুরাইলে আবার কলিকাতায় প্রস্থান করিল।

আজ সাত দিন হইল, নির্ম্মল কলিকাতায় গিয়াছে। নির্ম্মলের মাতার স্নানাহার নাই। তবে কি করেন, নিজে স্নান না করিলে পুত্রবধূ স্নান করে না, নিজে না খাইলে পুত্রবধূ খায় না, সুতরাং না করিলে নয় তাই স্নানাহার করিতেন। সুকুমারীও যাহা করিত তাহা কেবল শাশুড়ীর অনুরোধে। এই সাত দিনেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু দুটা ফুলিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহার সই নিস্তারিণী এক দিন

বলিল—"সই তুই হ'লি কি ? আর কি কখনও কারোও কেউ বিদেশে যায় না ?" সুকুমারী সে কথায় কোন উত্তর করিল না, নিস্তারিণীর গালে একটা ঠোনা মারিয়া, দুড় দুড় করিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

সেই দিন বৈকালে ভগবান দুইখানি পত্র আনিয়া দিল। তাহার উপর হাতের লেখা দেখিয়া বালিকার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ব্যস্ততার সহিত গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহার পত্র ?"

বালিকা উত্তর করিতে পারিল না, লজ্জাবনত মস্তকে নীরবে রহিল।

গৃহিণী বুঝিলেন। বলিলেন—"নির্ম্মল আমার ভাল আছে তো ?"

যে পত্র মাতার নামে আসিয়াছিল, বালিকা তাহা পাঠ করিয়া শুনাইল।

বৃদ্ধা বলিল— "আঃ বাঁচলেম, কালই মা শুভচুনির পূজা দিব।" বৃদ্ধা গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল।

বালিকা তখন আপনার পত্র খানি লইয়া শয়নকক্ষে গমন করিল। ধীরে ধীরে এক মনে সে পত্রখানি পড়িল। চারি পৃষ্ঠায় লেখা সে পত্র, সে চারি পৃষ্ঠা কেবল সুকুমারীর নামে পূর্ণ। বালিকা পড়িয়া একটু হাসিল। সাত দিনের পর বালিকা একটু হাসিল। নিজের কথা না লিখিয়া কেবল তাহার কথা লিখিয়াছেন সেজন্য স্বামীর উদ্দেশে রাগ করিল। রাগিয়া সে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ আবার হায় হায় করিয়া ছিন্ন অংশ গুলি একত্রিত করিতে লাগিল। এইরূপ হাসি কান্নায়, কোপে দুঃখে বালিকার সে দিন অতি-বাহিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে দিন গিয়া মাস আসিল। এক মাসের পর আর এক মাসও যায় যায়, নির্ম্মল খায়, ঘুমায়, বিদ্যালয়ে যায়, পাঠাভ্যাস করে। প্রত্যহ সুকুমারীকে একখানি করিয়া পত্র লিখে, প্রত্যহ সুকুমারীর একখানি করিয়া পত্র আসে। সুকুমারীকে পত্র লিখিবার সময় নির্ম্মল কাঁদে, সুকুমারীর পত্র পড়িবার সময় নির্ম্মল হাসে। এইরূপে সুখে দুঃখে, দুঃখে সুখে নির্ম্মলের এক মাস কাটিয়া গেল।

কুক্ষণে এবার নির্ম্মল বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। কুক্ষণে সে নগেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়াছিল। কিন্তু সে দোষ নির্ম্মলের নয়। এ সংসারে লোক চিনিতে পারে কয় জন? বিশেষ একে নির্ম্মল অপরিপক্কবুদ্ধি, নির্ম্মল প্রবাসে একাকী, নির্ম্মল বিরহ-বিকৃত, তায় নগেন্দ্র বন্ধুতার উপযাচক, নির্ম্মল যে নগেন্দ্রের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিল সে দোষ তাহার নয়। তাহার দোষ না হইলেও যে সময়ে উভয়ে প্রথম সখ্যতা হইয়াছিল, তখন মহাঘোর ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল, মঙ্গল ও শনি বক্র হইয়া অশ্লেষা ও মঘার প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—সুতরাং তাহা বড় কুক্ষণ।

নির্ম্মলের বাসার সম্মুখেই নগেন্দ্রের বাটী। নগেন্দ্র বড় লোকের সন্তান, নগেন্দ্র বড় চালে চলে। তেতালায় থাকে, নিত্য নূতন পোশাক পরে, নিত্য 'যুড়ি' করিয়া হাওয়া খাইতে যায়। প্রত্যহ নির্ম্মল নগেন্দ্রে সাক্ষাৎ হইত, প্রত্যহ নির্ম্মল নগেন্দ্রের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা করিত। কিন্তু পাছে নগেন্দ্র কিছু মনে করেন এই ভাবিয়া অগ্রে কিছু বলিতে সাহস করিত না। ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন রবিবার নগেন্দ্র

নিজে নির্ম্মলের বাসায় আসিলেন। নির্ম্মল তখন Macbeth পড়িতেছিলেন। ক্রূরমনা স্বার্থপিশাচ ম্যাক্‌বেথ ডনকানের বধের জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছে, সেই হস্তে লোলজিহ্ব শোণিতলিপ্সু শাণিত ছুরিকা অন্ধকারে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে, পার্শ্ব হইতে ডন্‌কানের একজন ভৃত্য ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া 'হত্যা হত্যা' বলিয়া চিৎকার করিতেছে, কণ্টকিত-শরীরে নির্ম্মল এই স্থান পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে নগেন্দ্র তথায় আসিলেন। পুস্তক মুড়িয়া ব্যস্ততার সহিত নির্ম্মল বসিতে আসন দিলেন।

তখন উভয়ে বিনয় শিষ্টাচার ও ভদ্রতাসূচক দুই একটি ভূমিকার পর সেক্সপীয়র সমালোচনা, সেক্সপীয়র হইতে কালিদাস সমালোচনা, নবাবী আমল ও ইংরাজী আমলের নানা কথা, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর ভালমন্দ বিচার, তাহার পর আপনাদিগের অবস্থাবর্ণনা এবং পরস্পরের নিকট বন্ধুত্ব প্রার্থনা—প্রভৃতি ভদ্রতার পরিচয়, জ্ঞানের পরিচয়, কুলের পরিচয় আরম্ভ হইল। কথায় কথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল। শেষ কি একটা কথায় দুইজনে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

এই সময়ে গৃহভিত্তিসংলগ্ন একটি ঘড়িতে ঠুং ঠুং করিয়া ৫টা বাজিল। অনাবশ্যক সত্বেও নগেন্দ্র পকেট হইতে আপনার স্বর্ণ ঘড়ি বাহির করিয়া একবার দেখিলেন। সহসা গাত্রোত্থান করিয়া নগেন্দ্র বলিলেন—"তবে আসি। বিশেষ একটা কাজ আছে—অদ্যকার মত বিদায় হই।" এই বলিয়া নগেন্দ্র হাত বাড়াইয়া দিলেন। নির্ম্মল আপন করে সে কর স্পর্শ করিল। কথঞ্চিৎ মস্তক নমিত করিয়া নগেন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

সেই দিন দুই জনেই ভাবিল, আজ বড় সুখের দিন। নির্ম্মলের পক্ষে সুখের দিন কেন না বিদেশে থাকিয়া তেমন সদ্বিদ্বান্ সদালাপী

সচ্চরিত্র একজন বন্ধু প্রাপ্ত হইলেন। নগেন্দ্রের পক্ষেও সুখের দিন সেই জন্য বটে, তবে কিছু স্বতন্ত্র।

নগেন্দ্র এই রূপ অনেক দিন দেখিয়াছে। এই বয়সে এই রূপে অনেককে মজাইয়াছে। লোক মজাইয়া, পরকে ঠকাইয়া তাহার এই বিষয় বৈভব। যথার্থই নগেন্দ্র বড় লোকের পুত্র নহে। সে কাহার সন্তান তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ ঠিক্ জানিত না। কারণ, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে * * রায় বাহাদূরের নাম করিত বটে, কিন্তু আমরা স্বরূপ জানি, সে রায় বাহাদূরকে নগেন্দ্রের মাতা কখন চক্ষেও দেখেন নাই। যাহা হউক, নগেন্দ্র 'স্বনাম্না পুরুষোধন্যঃ।' এই রূপেই তাহার মান, এই রূপেই তাহার সম্পত্তি। ইহাই তাহার ব্যবসায়। এ ব্যবসায়ে সঙ্গী বা সহচর অনেকে ছিল, নগেন্দ্র তাহাদিগের সর্দ্দার। সহরের অনেক কামিনী ভামিনী যামিনী নগেন্দ্রের হাতধরা। সে বড়ই চালাক, বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। বাল্যকালে, তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাইয়া তাহার মাষ্টার অতি যত্নে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। লেখাপড়ার সে চর্চ্চাটা নগেন্দ্র আজও রাখিয়াছিল, সময়ে সময়ে তাহাতে বড়ই কাজ দেখিত। আজ সেই বিদ্যার চটক দেখাইয়াই এত শীঘ্র কাজ হাসিল করিল। সহজেই নির্ম্মলকে ফাঁদে পড়িতে দেখিয়া নগেন্দ্র ভাবিল—আজ বড় সুখের দিন।

নগেন্দ্র ইহা ভাবিতে পারে। কিন্তু নির্ম্মল যদি অপরিপক্কবুদ্ধি না হইত, যদি তাহার নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণে নগেন্দ্রের উপরের ছবি না পড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার অন্তরের ছবি প্রতিভাত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্ম্মল ভাবিত, আজ বড়ই অশুভক্ষণে তাহার রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখের হউক, দুঃখের হউক, সেই দিন হইতে দুইজনে বন্ধুত্ব খুব বাড়িয়া উঠিল। প্রত্যহ নগেন্দ্র নির্ম্মলের বাসায় যাইতেন, মধ্যে মধ্যে নির্ম্মলও নগেন্দ্রের বাটীতে আসিতেন। কখন কখন নগেন্দ্র নির্ম্মলকে নিমন্ত্রণ করিতেন, নির্ম্মলও সময়ে সময়ে নগেন্দ্রকে প্রতিনিমন্ত্রণ করিতেন। বন্ধুত্ব জমিয়া আসিল। "আপনি" সম্বোধন গিয়া ক্রমে 'তুমি' হইয়া আসিল। নগেন্দ্র এক দিন বৈকালে নির্ম্মলকে থিয়েটারে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। থিয়েটারের উপরে নির্ম্মলের আজন্ম বিতৃষ্ণা,—নির্ম্মল যাইতে চাহিলেন না। বলিলেন—"একে তো ভাই আমি ও সব ভাল বাসি না, তায় পরীক্ষা নিকট; যাইলে পড়ার পক্ষে বিস্তর ক্ষতি হইবে।"

নগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কি, এত দিন কলিকাতায় আছ, থিয়েটার দেখ নাই ?"

নির্ম্মল বলিলেন—"না।"

"তবে আজ চল। প্রত্যহই তো পড়িয়া থাক, মধ্যে মধ্যে এক এক দিন শ্রমলাঘব জন্য একটু আমোদ করা ভাল।"—এই বলিয়া নগেন্দ্র হাত ধরিয়া বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা নির্ম্মল সম্মত হইলেন।

সেই দিন দুর্গেশনন্দিনী অভিনয় হইয়াছিল। নির্ম্মল ইতিপূর্ব্বে আর কখন থিয়েটার দেখে নাই। দেখিয়া বড়ই আমোদ হইল। বিশেষ সে দিন যে বিমলা সাজিয়াছিল তাহার অভিনয়-কৌশল নির্ম্মল ভুলিতে পারিল না। সেই দিন হইতে নির্ম্মল মধ্যে মধ্যে থিয়েটারে যাইত।

ইহার পর আর এক দিন নগেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া নির্ম্মলের হাতে একখানি পত্র দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"নির্ম্মল, আমার একটী বন্ধু দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে কাল গার্ডেনপার্টি দিবেন; তাঁহার নিতান্ত অনুরোধ তুমি উপস্থিত থাক। অতএব আমি বলিতেছি তোমায় যাইতে হইবে, ভাই।"

নির্ম্মল প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিল। বলিল—"পড়ার ক্ষতি হইবে।"

নগেন্দ্র বলিল,—"তুমি যে পড়া পড়া করে সারা হ'লে।"

"তাও বটে, আর এক কথা, আমার গাড়ী যাইতে পারিবে না। ঘোড়ার অসুখ হইয়াছে।"

"সে জন্য আবার ভাবনা কি? আমার গাড়ী তোমার গাড়ী কি ভিন্ন? আমরা একসঙ্গে যাইব।" নির্ম্মল ছাড়াইতে পারিল না। বলিল—"তবে যাইতেই হইবে?"

"তুমি কি বল, ভদ্রলোক এত করিয়া বলিয়াছে, না যাওয়া কি ভাল দেখায়?"

নির্ম্মল দেখিল, তাও সত্য। বলিল—'আচ্ছা।'

* * * *

তখনও ভাল করিয়া প্রভাত হয় নাই, তখনও দোয়েল প্রথম ডাক ডাকে নাই, নির্ম্মল ও নগেন্দ্র একখানি গাড়িতে উঠিলেন। নিমেষ মধ্যে গাড়ী গিয়া একটা প্রকাণ্ড বাগানের প্রকাণ্ড ফটকে লাগিল। সে বাগানে আরো অনেক গুলি লোক ছিল, সকলে আসিয়া আগ্রহে যথেষ্ট বিনয়ের সহিত নির্ম্মলকে অভ্যর্থনা করিল। নির্ম্মল তাহাদিগের ভদ্রতা দেখিয়া মনে মনে আপ্যায়িত হইলেন। এক বিস্তীর্ণ গৃহে বিস্তীর্ণ কার্পেটের উপর সকলে গিয়া উপবেশন করিলেন।

তার পর, অনেক কথা বার্ত্তার পর দুই প্রহর বাজিল। সকলের স্নানাহার হইল। আহারান্তে সকলে গিয়া আবার সেই শয্যার উপর বসিল। কেহ তাকিয়া লইল, কেহ গোগ্রাসে পান চিবাইতে লাগিল। কেহবা পাছে চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হয় এই জন্য চক্ষু বুজাইয়া, একাই সটকাটা দখল করিয়া বসিল। যে বড় বেশী খাইয়াছিল, সে উদ্গার তুলিতে তুলিতে একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল এই ভাবে কাটিলে আবার নানা কথা আরম্ভ হইল। প্রথম কথা, সেদিনকার রন্ধনের বিষয়, রন্ধনের কথা হইতে যোগাড়ের কথা উঠিল। তাঁহারা অনেক গার্ডেনপার্টি উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু এমন সুশৃঙ্খলা ও সর্ব্ব বিষয়ে পারিপাট্য আর দেখেন নাই। এ পার্টির বিশেষত্ব ইহাতে নির্ম্মল বাবুর শুভাগমন হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার কারণেই যে ইহা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন, সব রাখিয়া নির্ম্মলচন্দ্রেরই বাহবার ঘটা পড়িয়া গেল। লজ্জায় নির্ম্মল মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে ৪টা বাজিল। একজন খানসামা আসিয়া কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র রাখিয়া গেল। তখন তাহাদিগের মধ্য হইতে কয়েক জন এক একটি যন্ত্র লইয়া আলাপ করিতে লাগিল। নির্ম্মল দেখিল, তাহারা কেবল মিষ্টভাষী নয়, অনেকে এক একজন বাদকশ্রেষ্ঠ। অতৃপ্তলোচনে নির্ম্মল তাহাদিগের বাদনকৌশল দেখিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একজন নির্ম্মলকে বাজাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নির্ম্মল আপনার অপারগতা স্বীকার করিলেন। তখন আবার সেই সকল বিবিধ যন্ত্র এককালে বাজিয়া উঠিল। গৃহ আবার প্রতিধ্বনিত হইল। নির্ম্মল এবার শুনিল, সেই সকল ধ্বনি অতিক্রম করিয়া কাহার মধুর কণ্ঠধ্বনি উঠিতেছে। যেন এ কণ্ঠ কখন শুনিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল। মুহূর্ত্তমধ্যে হাসিতে হাসিতে দুলিতে দুলিতে গায়িতে গায়িতে একটী যুবতী আসিয়া সেই বিছানার মধ্যে বসিল। যেন প্রস্ফুটিত কমলদল মধ্যে রাজহংসী আসিয়া শোভিল। নির্ম্মল দেখিল, তাহার অনুমান অসত্য নহে।

যুবতীর গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যধ্বনি থামিলে নগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন —"এই, ভাই, তোমার বিমলা।" নির্ম্মল ইতিপূর্ব্বে বিমলার অভিনয় দেখিয়া এত মোহিত হইয়াছিল যে, সর্ব্বদাই সে কথা নগেন্দ্রের কাছে বলিত, সর্ব্বদাই সে কণ্ঠ শুনিতে ইচ্ছা করিত। নির্ম্মল কিছুই বলিল না, ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল মাত্র।

এই সময়ে খানসামা আসিয়া ডেকাণ্টার সহ চারিটি বোতল রাখিয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মল সেই লৌহতারমণ্ডিত বোতলে রক্তবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তরে শীহরিয়া উঠিল। যুবতী ভাবে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল— "নির্ম্মল—নির্ম্মল বাবু—" নির্ম্মলের গাত্রে যুবতীর গাত্র স্পর্শিল। অপ্রসন্ন হইয়া নির্ম্মল ভ্রূকুটী করিল। সে ভ্রূকুটী যুবতী মানিল না। সে ভ্রূযুগলে ফুলধনু সন্ধান করিয়া হাসিতে হাসিতে হেলিয়া দুলিয়া তাহার গায়ে টলিয়া পড়িল। নির্ম্মল একটু রাগিল। কিন্তু দেখিল রাগিয়া ফল হইবে না। বাস্তবিক সে রাগে কিছু ফল হইল না। যুবতী আবার গীত ধরিল, আবার ঢলিয়া পড়িল।

একবার—দুইবার—পাঁচবার—আর নির্ম্মল কি করিবে? যে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া স্থাণুবৎ তপোমগ্ন শশাঙ্কশেখরেরও এক দিন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, সেই রমণীর স্পর্শ—একবার নয়, পাঁচবার—আর নির্ম্মল কি করিবে? নির্ম্মলের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাহার সর্ব্বশরীর শীহরিয়া উঠিল। প্রতি শিরার মূল হইতে রক্তকণিকা সকল ছুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। যুবতী দেখিল, ঔষধ ধরিয়াছে। তখন পাপিয়ার

কণ্ঠকে লাঞ্ছনা করিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে গায়িল— "পিয়ালা মুঝে ভরে দে।" গায়িতে গায়িতে বোতল হইতে এক গেলাস সুরা লইয়া নির্ম্মলের মুখের কাছে ধরিল। নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া লইল।

তখন, চারিদিক হইতে মহা অনুরোধ পড়িতে লাগিল। যার যেমন ক্ষমতা সুরাপান সম্বন্ধে আপন আপন যুক্তি দেখাইতে লাগিল। সকল যুক্তি—সকল অনুরোধের উপর—সে সুরা রমণীহস্তে! আবার নগেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, একবারে Prejudice থাকা ভাল নয়, ডাক্তারেরাও নিয়মিত পানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ফলতঃ নিয়মিত হইলে উপকার ভিন্ন কোনও অপকার নাই।

নির্ম্মল ফাঁফরে পড়িল। সেই চক্র হইতে এড়াইবার তাহার সাধ্য কি? প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখন এরূপ স্থলে আসিবে না, আর কখন নগেন্দ্রের সহিত বেড়াইতে যাইবে না। কিন্তু এখন উপায়? ভাবিল, একদিন একটু খাইলে কিছু একেবারে পানাসক্ত হইবে না। অধঃপতনে যাইবার পূর্ব্বে লোকে যেরূপ ভাবে নির্ম্মল তাহাই ভাবিল। রাগে, ঘৃণায়, অনিচ্ছায় সেই রক্তকমলকান্তি হস্ত হইতে সেই রক্তকমল-কান্তি সুরা গ্রহণ করিল। নগেন্দ্রের চক্র সিদ্ধ হইল। নির্ম্মল সুরা পান করিল।

এই সময়ে কাঞ্চনপুরের বাটীতে একটা কাক বড় বিকট চিৎকার করিতেছিল। নির্ম্মলের মাতা তাহাকে মারিবার জন্য একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া দৌড়িয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ চৌকাঠে বাধিয়া বৃদ্ধা পড়িয়া গেলেন। দূরে সুকুমারী বসিয়াছিল, হস্তচ্যুত হইয়া সে কাষ্ঠখণ্ড ঠিক্‌রাইয়া গিয়া তাহার কপালে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তার পর, সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল। তখনও নির্ম্মল সেই চক্র মধ্যে নেশায় পড়িয়া।

সেই কাল-রাত্রি ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল। মুক্তবাতায়নপথ দিয়া প্রভাতবায়ু আসিয়া ধীরে ধীরে নির্ম্মলের অঙ্গ স্পর্শ করিল। ধীরে ধীরে নির্ম্মলের নেশা ছুটিল। নির্ম্মল কখন কিরূপে নরকসদৃশ সেই উদ্যান হইতে বাসায় আসিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণ হইল না। কিন্তু নির্ম্মল দেখিল, আপনার শয্যায় শুইয়া আছে। ভাবিল, এ কি স্বপ্ন না মদিরার মাদকতা? একবার বিকলচিত্তে শূন্যদৃষ্টে চারিদিকে চাহিল। ভাল করিয়া দেখিতে কিন্তু সাহস হইল না। ভয়, পাছে সেই বীভৎস নগেন্দ্র, সেই বীভৎসময়ী যুবতীকে দেখিতে পায়। নির্ম্মল কিছুই দেখিল না। দেখিল, রশ্মিকীরিট তখন ধীরে ধীরে পূর্ব্বগগনে উদিতেছে, তাহার আলোক আসিয়া গৃহময় খেলিতেছে।

নির্ম্মল এ সকল দেখিল, আর দেখিতে পারিল না। মনের দারুণ আবেগে দুই চক্ষে হাত দিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। বলিল —'প্রভো! পতিতপাবন! এ পতিতকে রক্ষা কর। অজ্ঞান অসৎ তোমার সন্তান, আপনি মজিতে ও পরকে মজাইতে বসিয়াছে। হৃদয়ে বল নাই। দুর্ব্বলের বল! অনাথনাথ! এ দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও।' নির্ম্মল কাঁদিল। সে সময়ে গৃহে আর কেহ ছিল না, নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া অজস্রধারে নির্ম্মল কাঁদিল। মনের আবেগে বসিতে পারিল না। উঠিয়া একবার গৃহে পাদচারণা করিল। আবার আসিয়া বিছানায় বসিল। আবার নির্ম্মল কাঁদিল।

সহসা দরজায় কাহার পদধ্বনি হইল। চঞ্চলচক্ষে নির্ম্মল সেই দিকে চাহিল। দেখিল, সাক্ষাৎ পাপমূর্ত্তি নগেন্দ্র আসিতেছে। সর্ব্ব-শরীর শীহরিল, ব্যস্ততার সহিত চক্ষু মুছিল। নষ্টবুদ্ধি নগেন্দ্র এতক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া সকল দেখিয়াছিল, নির্ম্মলের অবস্থা বুঝিল। অন্য কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল—"তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

নির্ম্মল কথা কহিল না, উদাসদৃষ্টে নগেন্দ্রের পানে চাহিল।

মুহূর্ত্তের জন্য সে দৃষ্টিতে নগেন্দ্রের লৌহহৃদয় কাঁপিল। বলিল—"অমন করিতেছ কেন? কি অসুখ হইয়াছে?"

নির্ম্মল কথা কহিল না। নীরবে কাঁদিল।

নগেন্দ্র বলিল—"বুঝিয়াছি, অসুখ ভাল হইবে, আমার কথা রাখিবে কি?"

নির্ম্মল তখন ধীরে ধীরে বলিল—"কি কথা বল।"

"এ অসুখের ঔষধ আছে, দিতেছি,—খাইবে কি?"

নির্ম্মলের হৃদয়ে তখন ঘোর যাতনা; সে যন্ত্রণা সহ্য করা তাহার পক্ষে ভয়ানক। বলিল—"কি ঔষধ? এ যাতনা নিবারণ হয় এমন কি ঔষধ আছে? দাও, খাইব।"

কিয়ৎক্ষণের পর নগেন্দ্র একটি কাচের পাত্রে কি ঔষধ আনিল। বলিল—"তুমি হা কর—আমি ঢালিয়া দিই।"

নির্ম্মলের তখন বুদ্ধি ছিল না, হা করিল। ধীরে ধীরে নগেন্দ্র তাহার গালে সেই ঔষধ ঢালিয়া দিল। নির্ম্মল ঔষধ খাইয়া একবার চক্ষু বুজাইল, একবার মুখমণ্ডল বিকৃত করিল, একবার নগেন্দ্রের প্রতি ভ্রুকুটী করিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখিল, ঔষধ উপকারী বটে, ঔষধের গুণে হৃদয়ের সে জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইল।

তার পর, নির্ম্মলের হৃদয়ে প্রত্যহ যন্ত্রণা হইত, নির্ম্মল প্রত্যহ সে ঔষধ খাইত। পূর্ব্বে হৃদয়ে যন্ত্রণা হইলে খাইত; এখন পাছে যন্ত্রণা হয় এই ভয়ে খাইত। নির্ম্মলের সে সেক্সপীয়র, সে কালিদাস, সে মিল, সে কোমৎ সে সব গেল। এক্ষণে তাহার ঔষধের বোতল, ঔষধের গেলাস। টেবিলের উপর স্তূপকারে পুস্তক থাকিত, নির্ম্মল তাহা ফেলিয়া তাহার উপর বোতল, গেলাস স্তূপাকারে সাজাইল। একমাসের মধ্যে নির্ম্মল ঘোর মাতাল হইয়া উঠিল।

নির্ম্মল বিদ্যালয় ছাড়িল, লেখাপড়া ছাড়িল। লেখাপড়ার ব্যয়ের জন্য মাসে মাসে যে খরচ আসিত তাহা দিয়া সে মদ কিনিত। ক্রমে মদের খরচ বাড়িয়া উঠিল। সে অল্প খরচে হইত না, প্রথম প্রথম নির্ম্মল পাঠ্য পুস্তকগুলি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। তাহা ফুরাইল। তখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া নগেন্দ্রের কাছে ধার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিনা বন্ধকে সর্ব্বদা হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিতে নগেন্দ্র স্বীকৃত হইল না। অগত্যা বিষয় বন্ধক দিয়া টাকা লইতে লাগিল। নগেন্দ্রও তাহাই চায়। বলা বাহুল্য, নগেন্দ্র অনেক আত্মীয়তা জানাইয়া হাজার টাকার বিষয় পাঁচশ টাকায় লিখাইয়া লইল।

এ সংবাদ নির্ম্মল আত্মীয় স্বজন কাহাকেও বলিল না, বলিতে তাহার সাহস ছিল না। কেবল বৃদ্ধ সরকার ভগবান দাসকে না বলিলে চলে না, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে লিখিত। ভগবান যাহাতে এ কথা প্রকাশ না করে সে জন্য তাহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া লিখিত। ভগবান মনিবের চাকর, মনিব যাহা গোপনে রাখিতে বলিয়াছেন। প্রাণ গেলেও তাহা ভৃত্য হইয়া কখনই প্রকাশ করিতে পারে না। ভগবান কাহাকে ও কিছু বলিল না। বিষয় বন্ধক পড়িতে লাগিল।

ভগবান দেখিল, গতিক ভাল নয়—সব গিয়াছে, শেষ ব্রহ্মোত্তর কয় বিঘাও বুঝি যায়। হঠাৎ ভগবান বিষয় বন্ধকে আপত্তি জানাইল। নির্ম্মল একটু রাগিলেন? আমার বিষয়, আমি মানিব, সে চাকর আমার বিষয়ে তার কি অধিকার? নির্ম্মল ভগবানকে গালি দিয়া কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু পাছে মা জানিতে পারেন, এই ভয়ে পারিল না। এ দিকে অর্থের আবশ্যক। নির্ম্মল কয়দিন ভাবিয়া এক উপায় ঠিক্ করিল।

নির্ম্মল পত্নীকে লিখিল—"পরীক্ষা সম্মুখে, পড়ায় বড় ব্যস্ত, পূজার ছুটীতে যাইতে পারিব না, সে জন্য ভাবিও না। আমার ভারি বিপদ হইয়াছে, অর্থের আবশ্যক; মাকে বলিও না, যাহা পার, খরচ পাঠাইয়া দিও।" সুকুমারী সে পত্র পড়িয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিল। কি হইবে—কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। যাহাদিগকে বলিলে কোনরূপ উপায় হইবার সম্ভাবনা তাহাদিগকে বলা নিষেধ সুতরাং তাহা বলিতে পারিল না। চুপে চুপে সে বড় কান্না কাঁদিল। শেষ পাড়ার একজনের নিকট গোপনে নিজের একখানি গহনা বন্ধক দিয়া গোপনে টাকা পাঠাইয়া দিল। নির্ম্মল তাহা দিয়া মদ কিনিল!

নির্ম্মল এইরূপে সেই এক বিপদের কথা বলিয়া বালিকাকে পত্র লিখিতে লাগিল। বালিকা ভয়ে আকুল হইয়া যা কিছু গহনা ছিল একে একে সমস্ত বন্ধক দিয়া অর্থ পাঠাইতে লাগিল। সুতরাং নির্ম্মলের পানদোষ কোনও বাধা না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বালিকা আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূজা গিয়াছে। নির্ম্মল আসিল না। শীতের ছুটীও গেল, তবু নির্ম্মল আসিল না।

সুকুমারী নির্ম্মলের কোন সংবাদই পায় না। প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখে, কিন্তু তাহার উত্তর পায় না। পূর্ব্বে প্রত্যহই একখানি করিয়া পত্র পাইত, এখন মাসান্তে একখানি পাওয়া ভার। সেও যাহা পায় তাহাতে সেই বিপদের কথা, সেই অর্থযাচ্ঞা। সুকুমারী ইহা ভিন্ন অন্য কোনও সংবাদ পায় না।

গৃহিণী প্রত্যহ আসিয়া বধূকে পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। বালিকা নিজে যে ভাবনায় আকুল হইতেছে, বৃদ্ধাকে সে ভাবনায় পীড়িত করিতে চাহিত না। বালিকা মিথ্যা করিয়া বলিত—"ভাল আছেন, পড়ায় বড় ব্যস্ত সেই জন্য আসিতে পারেন না।" বৃদ্ধা তাহাতেই চরিতার্থ হইত। তবে মধ্যে মধ্যে মনে মনে বলিত—"এখনকার ছেলেরা এক রকম; স্ত্রীর কাছে নিত্যই চিটি—নিত্যই পত্র। কিন্তু আমি যে মা, আমি মলুম কি থাকৃলুম একবার জিজ্ঞাসাটাও করে না। যা হউক, ভাল আছেন, এই ভাল।" বৃদ্ধা ইহাতেই চরিতার্থ হইত।

ভগবান দাসও অন্য কোন সংবাদ পাইত না। যে দিন সে বিষয় বন্ধকে আপত্তি জানায় সেই দিন হইতেই তাহার পত্র বন্ধ হইয়াছিল। ভগবানের ইহাতে দুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না। কিন্তু কি করিবে—জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া ইহাতে অনুমোদন করিবে? কেমন করিয়া প্রভুপুত্রের অবনতির পথে সহায় হইবে? কিন্তু নির্ম্মলের আজ্ঞা পালন করিতে না পারায় সে বড় অসুখে দিন কাটাইতেছিল। এক একবার তাঁহার কাছে যাইতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু যাইলে পাছে নির্ম্মলের

কথা এড়াইতে না পারে এই ভয়ে সাহস করিত না। ভগবান জানিত, মধ্যে মধ্যে বাড়ীর ভিতর পত্র আসে ; শুনিত বাবু ভাল আছেন। সে তাহাতেই চরিতার্থ হইত।

একদিন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ভগবান একখানি পত্র ভিতরে দিয়া আসিল। পত্রখানি সুকুমারীর নামে আসিয়াছিল। আপনার গৃহে গিয়া দীপালোকে বালিকা সে পত্রখানি ধীরে ধীরে পাঠ করিল। পড়িবার সময় তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিতেছিল, চক্ষুকর্ণ দিয়া তাড়িত প্রবাহ ছুটিতেছিল, শিরায় শিরায় রক্ত ভীষণ বেগে বহিতেছিল। বালিকা সে পত্রখানি পড়িল। "সর্ব্বনাশ! হা জগদীশ! অভাগীর অদৃষ্টে কত যন্ত্রণা লিখিয়াছিলে! এক্ষণে কি হইবে—একে বালিকা তায় কুলবধূ, সে কেমন করিয়া ইহার উপায় করিবে? হায়! কেন এমন হইল? প্রভো! কেন এমন করিলে? এ বিপদ কি কাটিবে না? এবার কলিকাতায় গিয়া অবধি এই বিপদ উপস্থিত, ইহা হইতে কি নিস্তার হইবে না? পাছে মা জানিতে পারেন, পাছে জানিয়া মা উতলা হন, এই জন্য চুপে চুপে আমাকে লিখিতেন, আমিও চুপে চুপে এত দিন টাকা পাঠাইয়াছি। কিন্তু আর কি করিব? আর গহনা নাই যে, বন্ধক দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিব? কিন্তু এ বিপদের কথা শুনিয়া কেমন করিয়াইবা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব?" বালিকার দুই চক্ষু ফাটিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে গেল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আবার বালিকা ভাল করিয়া আগাগোড়া সেই পত্রখানি পড়িতে লাগিল। এ তো তাঁহারই হাতের লেখা,—সেই গোটা গোটা মুক্তার ন্যায় অক্ষর। কিন্তু দূর হইতে যে অক্ষর দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তাহা পড়িয়া আজ প্রাণ এত চমকিয়া উঠে কেন? কি সর্ব্বনাশ! লিখিয়াছেন—"সুকুমারি,

তোমাদের আশা বুঝি ছাড়িতে হইল। বিপদ আজ ও কাটিল না। বিপক্ষেরা মোকদ্দমা করিতেছে। পাঁচহাজার টাকা নিতান্ত আবশ্যক। জামিন দিতে হইবে; নহিলে হাজতে যাইব।' আর লিখিতে পারিলাম না। তুমি বুদ্ধিমতী, সাধ্বী—যাহা হয় করিও।" বালিকা শিহরিয়া উঠিল। নির্ম্মলের চরিত্রের উপর তাহার তিলার্দ্ধও সন্দেহ হইল না। আছাড় খাইয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। এতদিন শাশুড়িকে না বলিয়া স্থির হইয়াছিল; আর স্থির থাকিতে পারিল না। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

ঠাকুর-ঘরে জপ করিতে করিতে বৃদ্ধা পুত্রের উদ্দেশে আশীর্ব্বচন পাঠ করিতেছিল। হঠাৎ দক্ষিণ চক্ষু নাচিয়া উঠিল, বৃদ্ধা মন্ত্র ভুলিয়া গেল। শঙ্কিতমনে শূন্যদৃষ্টে বৃদ্ধা চারিদিকে চাহিল। পুত্রবধূর ক্রন্দনশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি বধূর গৃহের দিকে ছুটিল। পায়ে উছট লাগিল—একটা আঙুল ছিঁড়িয়া গেল। সে বিষয়ে দৃকপাত না করিয়া বধূর নিকট দৌড়িয়া চলিল। দেখিল, ধুলার উপর পড়িয়া বালিকা অজস্রধারে রোদন করিতেছে। বৃদ্ধা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া-স্তম্ভিত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—"কি হয়েছে বল মা, শিগ্‌গির, বল।'

বালিকা কিছু বলিতে পারিল না; আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধা আকুল হইল। দেখিল, দূরে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"নির্ম্মল আমার কেমন আছে? কৈ তার—" আর বৃদ্ধা বলিতে পারিল না। বসিয়া পড়িয়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল।

তখন সুকুমারী দেখিল মার কাছে না বলিলে আর চলে না। কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা বলিল, কেবল আপনি যে এত দিন টাকা

পাঠাইয়াছে তাহা বলিল না। স্থির হইয়া বৃদ্ধা সকল কথা শুনিল। পুত্রবধূ এতদিন কিছু তাঁহাকে বলে নাই বলিয়া অনেক দুঃখ করিল, "নির্ব্বোধের মেয়ে" বলিয়া একটু ভৎর্সনা করিল। তার পর পুত্রের উদ্দেশে বলিল—"বাছা আমার, টাকার জন্য তুমি হাজতে যাবে! টাকা লইয়া আমার কি হইবে? তুমি যে আমার সর্ব্বস্বধন।" বৃদ্ধা একটু কাঁদিল, নির্ম্মলের শত্রুর উদ্দেশে অনেক গালি দিল। তার পর কালী, শিব, দুর্গা, শুভচুনি—বৃদ্ধা যত দেবতার নাম জানিত একে একে সকলের উদ্দেশে মাথা কুটিতে কুটিতে পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল।

ভগবান দাস এতক্ষণ বাড়ীতে ছিল না; পত্রখানি দিয়া তাগাদায় বাহির হইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া দেখিল, বিষম বিপদ। বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। ভগবান অতি চতুর লোক, পত্রের মর্ম্ম বুঝিল। বুঝিল, যে কারণে এত বিষয় বন্ধক পড়িয়াছে ইহা তাহাই। বাবুর টাকার আবশ্যক, তাই এই ভয়ানক পত্র। কয় দিন ধরিয়া ভগবানের মনে বড়ই একটা খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছিল, কি জানি কেন সেটা যেন ইহাতে আরও বদ্ধমূল হইল। ভগবান কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিল না। বলিল—"সে জন্য কাঁদিতেছেন কেন? কাঁদিয়া কি হইবে? আমি টাকার যোগাড় করিতেছি, চলুন আজই বাবুর বাসায় যাই।"

এ সময়ে ভগবানের এ প্রস্তাব সকলেরই বড় ভাল লাগিল। তাঁহারা কলিকাতায় যাইতে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান কলিকাল ও বড়মানুষের ছেলেদের কথা ভাবিতে ভাবিতে গাড়ি করিবার জন্য বাজারে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। আকাশ মেঘপূর্ণ, চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়। কেবল সে অন্ধকারে সারি সারি স্তম্ভের উপর ধীরে ধীরে গ্যাসালোক জ্বলিতেছে, ধীরে ধীরে টিপ টিপ করিয়া এক এক ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছে —এমন সময়ে নির্ম্মলের বাসায় একখানি গাড়ি আসিয়া লাগিল। বৃষ্টি দেখিয়া সে বাটীর দরজায় একটি পাহারাওয়ালা আশ্রয় লইয়াছিল, প্রচণ্ড খরসানের নেশায় বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল; হঠাৎ পায়ের শব্দ পাইয়া "কোন হ্যায়" বলিয়া চমকিয়া উঠিল। গাড়ীর কোচবাক্সে যে বসিয়াছিল সে নামিয়া পাহারাওয়ালা সাহেবের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া রূপো রূপো করিয়া ভৃত্যকে ডাকিল। রূপো দৌড়িয়া আসিল। তখন গাড়ী হইতে দুইটি স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রূপো দ্রব্যাদি উঠাইতে ব্যস্ত হইল। পাহারাওয়ালাও প্রভুত্ব করিবার অবসর না পাইয়া মনে মনে বকিতে বকিতে তথা হইতে চলিয়া গিয়া এক পানওয়ালীর ঝাঁপ ঠেলিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাত্রি দশটা বাজিয়াছিল। কিন্তু নির্ম্মলের মাতা ও সুকুমারী দেখিল তখনও নির্ম্মল বাটী আসে নাই। তাহাদিগের মনে নানা মন্দ ভাবনা উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের বুঝি তবে কোন মন্দ ঘটিয়াছে। ভয়ে তাহারা আকুল হইল। ভগবান রূপোকে জিজ্ঞাসা করিল। রূপো বলিল, কোথায় নিমন্ত্রণ আছে; শীঘ্রই আসিবেন। রূপো আদত খবর জানিত, কিন্তু তাহা বলিল না। সে তাঁহাদিগের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। তাঁহারা বলিলেন, আহার করিবেন না। নির্ম্মলের আগমন-প্রতীক্ষায় সেই রাত্রে বৃদ্ধা ও বালিকা জাগিয়া গৃহের দুয়ারে বসিয়া রহিল।

১১টা বাজিল। তখনও নির্ম্মল আসিল না। ১২টা—১টা। টলিতে টলিতে, হেলিতে হেলিতে নির্ম্মল আসিয়া ডাকিল—রূপো। রূপো সেয়ানা চাকর, দরজায় বসিয়াছিল। দ্বার খুলিয়া দিল। কিছু বাবুকে বলিবে মনে করিল, কিন্তু পারিল না। সেই রূপ টলিতে টলিতে নির্ম্মল উপরে উঠিয়া পড়িল।

গলার আওয়াজ শুনিয়াই নির্ম্মলের মাতা ছুটিয়া সিঁড়ির কাছে আসিলেন, বলিলেন—"নির্ম্মল, বাবা, ভাল আছ তো।"

নির্ম্মল তখন সেই বিমলা ও সেই বিমলার গান—"পিয়ালা মুঝে ভরে দে" ইত্যাদি ভাবিতেছিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—'তুমি কে বাবা ?'

বৃদ্ধা শীহরিল। দেখিল, নির্ম্মলের কথা জড়ান জড়ান, পা ঠিক থাকিতেছে না। দ্বারে আলোক জ্বলিতেছিল, সে আলোকে দেখিল, চক্ষু জবার ন্যায় রক্তবর্ণ। বৃদ্ধা শীহরিল। একটু কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'ইহার মধ্যেই ভুলে গেলি ? আমি যে, নির্ম্মল তোর মা হই বাবা।'

পাষণ্ড আবার উচ্চহাস্য করিল। বলিল—'মা ! কস্য মাতা কস্য পিতা!' আবার উচ্চে হাসিল। বৃদ্ধা কপালে কর হানিল, কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে গেল।

আর সুকুমারী ? দূরে দাঁড়াইয়া সুকুমারী ইহা দেখিতেছিল। ভাবিল এ কি! উনি কেন এমন হ'লেন ? তথাপি বালিকার নির্ম্মলের উপর কোনও সন্দেহ হইল না। মাতা চলিয়া গেলে, ধীরে ধীরে নির্ম্মলের কাছে আসিল। নির্ম্মল তখন গৃহের ভিতর।

ধীরে ভয়বিকম্পিতস্বরে বালিকা বলিল—'মাকে কি বলিয়াছ ?' তিনি যে কাঁদিতেছেন।'

পাষণ্ড আবার সেই হাসি হাসিল। বালিকার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। বলিল—"অমন করিয়া হাসিতেছ কেন?"

"হাসিতেছি কেন? হাসিব না! তুমি বিমলা তুমি মনে করিয়াছ, আমি বুঝি তোমায় চিনিতে পারিব না! কেমন—কেমন—হা হা হা হাঃ—" আবার সেই হাসি। বালিকা স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সকল বুঝিল। বুঝিল, তাহার কপাল পুড়িয়াছে। কিন্তু যে নির্ম্মল একদিন বলিয়াছিল, ওমুখ দেখিয়া যে একবার মজিয়াছে, আর কেহ তাহাকে মজাইতে পারিবে না—সেই নির্ম্মল ইহার মধ্যে কেমন করিয়া এমন হইল তাহা বুঝিতে পারিল না। বালিকা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। আর দাঁড়াইতে পারিল না, মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল। নীরবে চোখের জলে দুই গণ্ড ভাসিতে লাগিল।

এই সময়ে "বিমল—বিমল! তুমি একবার সেই গানটি গাও, আমি নাচিব"—এই বলিয়া পশুবৎ উন্মত্ত নির্ম্মল পশুবৎ উন্মত্ত ভাবে নাচিতে লাগিল।

"হা ভগবন্!" বালিকা আর বলিতে পারিল না। মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

"Bravo! Bravo! বাঃ বেশ পড়েছ! আমিও পড়িব—আগে থিয়েটার দেখিতাম না, এখন দেখিয়া শিখিয়াছি, আমিও পড়িব—পতন ও মূর্চ্ছা"—এই বলিয়া নির্ম্মল সেই বালিকার অঙ্গে পড়িল। অত্যন্ত নেশা হইয়াছিল, নির্ম্মল পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না। বিকট রূপে বমন করিয়া ফেলিল। বালিকা সেই পূতিগন্ধময় বমনরাশি মধ্যে ভাসিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ এক সপ্তাহ হইল, সুকুমারী ও তাহার শাশুড়ী নির্ম্মলের বাসায় আসিয়াছেন। ক্রমে নির্ম্মলের বিষয় একে একে তাঁহারা সকলই শুনিলেন। নির্ম্মলের বিপদের কথা যে কিছুই নয়—ছলমাত্র তাহাও তাঁহারা বুঝিলেন। নির্ম্মল এখন প্রায় বাসায় আসা ছাড়িয়া দিয়াছে, একবার মাত্র খাইবার সময় আসিত। সুকুমারী দিনান্তে আর সাক্ষাৎ পাইত না। তাহার এখন দিন রাত্রি আহার নিদ্রা নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিত, স্বামীর জন্য দেবতাদিগের নিকট কাতরে প্রার্থনা করিত, কিন্তু সে জন্য কখনও স্বামীকে কোন কথা বলিত না। আপনার অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিত। ভাবিত—উঁহার দোষ কি? আমি অভাগী কেন তখন বুঝিলাম না, কেন প্রত্যহ টাকা পাঠাইতাম, কেন ঠাকুরাণীকে বলিলাম না, কেন মরিলাম?—বালিকা ভাবিত, বুঝি তাহা হইলে এমন হইত না, বুঝি সে সময় হইতে সাবধান হইলে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। বালিকা আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, আর নিভৃতে রোদন করিত।

এক সপ্তাহের মধ্যে ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বৃদ্ধার ভয়ানক জ্বর হইল। নির্ম্মল মাকে একবারও দেখিত না। ভগবান বৈদ্য আনিয়া ব্যবস্থা করিলেন। বৈদ্য বলিলেন, রোগ সহজ নহে। বালিকা আরো অন্ধকার দেখিতে লাগিল, বালিকার রোদন আরো বাড়িল। দেখিতে শুনিতে আহা বলিতে একমাত্র ভগবান; ভগবানও সাক্ষাতে পারিত না, গোপনে বাবুর জন্য কাঁদিত।

বালিকা এক দিন ভাবিল, মরি না কেন? আর সুখ কি? তখন সুখ ছিল বাঁচিয়া ছিলাম—এখন মরি না কেন? বালিকা মৃত্যু প্রার্থনা

করিল। আবার তখনই ভাবিল, মরিব মনে করিলেই বা মরি কেমন করিয়া? হায় বিধি! জ্বালার উপরে এ জ্বালা কেন? সুকুমারী তখন আটমাস অন্তঃস্বত্ত্বা। বলিল—মরিব কেমন করিয়া? এ জন্মে এই হইল, আর জন্মে—শুদ্ধ আত্মহত্যা নয়, আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা—আর জন্মে আবার এ পাপের জন্য কি হইবে? না, মরা হইল না। বালিকা মরিল না।

বালিকা ভাবিল মরিব না কিন্তু, মৃত্যু বুঝি সে কথা শুনিল না। সেই রাত্রে—তখন একটা বাজিয়াছিল—সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ, নির্জ্জন—সেই রাত্রে টলিতে টলিতে উঠিতে পড়িতে, পড়িতে উঠিতে নির্ম্মল আসিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল। বালিকা তখনও বসিয়া কাঁদিতেছিল। দেখিল স্বামী সম্মুখে,কিন্তু স্বামীর অবস্থা বড় ভয়ানক। সে অবস্থা দেখিয়া অন্তরে শীহরিয়া উঠিল। কিছু বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বলিবে কি,কথা কহিবার আগেই চোখের জলে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিৰ্ম্মল বলিল—"সুকুমারি, আজ আর শুনিব না, আজ আমাকে এই দণ্ডে কিছু টাকা দিতেই হইবে—কাঁদিও না, কাঁদিলে ফল হইবে না—আমার টাকা চাই, টাকা দাও।"

বালিকা মুহূর্ত্তের জন্য আকাশ পাতাল ভাবিল। কাঁদিয়া বলিল—"টাকা নাই—যা ছিল দিয়াছি, আর কোথায় পাইব?"

"সে কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা বলিলে চলিবে না—টাকা নাই? নাই থাকিল, আমায় দাও।"

'নাই, কি দিব?'

"আমি স্বামী, আমি চাহিতেছি—আমায় দিবে না?"

বালিকা কাঁদিল, বলিল—"ঈশ্বর জানেন যখন ছিল দিয়াছি, এখন নাই -কোথায় পাইব?"

বালিকার সে পবিত্র মুখে ঈশ্বরের পবিত্র নাম শুনিয়া নির্ম্মলের পাপহৃদয়ও মূহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। সে নাম তাহার সহ্য হইল না। বলিল—"ঈশ্বর ডাকিয়া মিথ্যা কথা কহিও না। ওই যে তোমার হাতে গহনা রহিয়াছে।"

গহনা আর কিছুই ছিল না। সধবার চিহ্নস্বরূপ বামহস্তে মাত্র একগাছি সুবর্ণজড়িত 'নোয়া' ছিল। নির্ম্মল বলিল-'ঐ যে তোমার গহনা রহিয়াছে, আমি স্বামী, আমার নিকট প্রবঞ্চনা করিও না। আমার বড় আবশ্যক, উহা আমায় দাও।"

বালিকা কাঁদিল। বলিল—"উহা হইলেই যদি হয় তবে দিতেছি। কিন্তু আগে একগাছি লোহার খাড়ু আনিয়া দাও তাহা পরিয়া আমি উহা খুলিয়া দিতেছি।"

নির্ম্মল বলিল—"ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিও না, তোমার জন্য আমি এখন লোহার খাড়ু আনিতে কোথায় যাইব? সে সব কথা রাখ, এখন উহা খুলিয়া দাও।"

অতিকাতরে বালিকা বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, ও কথা বলিও না। শুধু হাত ধরিয়া উহা আমি প্রাণ ধরিয়া দিতে পারিব না। দেখ—" দারুণ দুঃখের উচ্ছ্বাসে বালিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর বলিতে পারিল না। অশ্রুর পর অশ্রুর প্রবল ধারায় গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল।

নির্ম্মল রাগিল। রাগিয়া বলিল—"সুকুমারি-সুকুমারি, দেবে না!" তাহার স্বর কর্কশ, পরুষ, অতি রুক্ষ; ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতেছিল।

বালিকা কোন উত্তর করিল না, নীরবে কাঁদিল। তখন পাষণ্ড আরো রাগিল, বালিকার কেশাকর্ষণ করিল। বলিল—"এখনও বলিতেছি, যদি ভাল চাও, উহা খুলিয়া দাও।"

ভয়ে বালিকা মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল, একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিল, আবার বালিকা কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মারিয়া ফেল, এ ছার প্রাণে আর কিসের প্রয়োজন? কিন্তু মরিবার আগে ইহা খুলিয়া আমি তোমার অমঙ্গল করিতে পারিব না।" অতি করুণ স্বরে বালিকা এ কয়টি কথা বলিল। সে স্বর শুনিলে পাষাণও ভেজে, কিন্তু নির্ম্মলের হৃদয় ভিজিল না। তখনও বালিকার আলুলায়িত কেশাগ্রভাগ তাহার মুষ্টিমধ্যে।

"ও কথা শুনিতে চাহি না, উহা আমার চাই, আমায় খুলিয়া দে।"—ইহা বলিয়া পাষণ্ড সবলে সে কেশ ধরিয়া টানিল। বালিকা বসিয়াছিল, পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল। কিন্তু সে আঘাতের জন্য কোন কষ্ট বালিকার হৃদয়ে স্থান পাইল না। সে দেখিল, তাহার মাথা স্বামীর চরণের উপর পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য বালিকা স্বর্গসুখ অনুভব করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বোধ হইল যেন, নন্দনকাননে স্তবকে স্তবকে মন্দার পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা হইতে অপার্থিব স্বর্গীয় সুরভি নিঃসৃত হইতেছে, আর বালিকা সেই ফুল রাশির উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আবার তৎক্ষণাৎ ভাবিল, হয়ত স্বামীর পায়ে কত ব্যথা লাগিয়াছে—বালিকা তাহা ভাবিয়া কাতর হইল। আকুলিতনেত্রে একবার স্বামীর পানে চাহিল। আবার সে পদতলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হতভাগ্য নির্ম্মল দেখিল, গতিক ভাল নয়। ক্রমশই বিলম্ব হইতেছে। বিলম্বে তাহার কার্য্যসিদ্ধি না হইতে পারে। অথচ কোন

উপায়ও নাই। খোঁয়ারির প্রবল উত্তেজনায় সে উন্মত্তপ্রায়—পয়সা না হইলেই নয়। আর থাকিতে না পারিয়া উন্মত্তপ্রায় নির্ম্মল ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া বালিকাকে আক্রমণ করিল। জোরে সে গহনা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। বালিকার ক্ষীণ দেহ অনাহার ও অনিদ্রায় আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু মাত্র বল ছিল না, তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু হৃদয়ের বল তখনও তাহাকে ছাড়ে নাই। বালিকা তাহা ছিনাইয়া লইতে দিল না।

আর লিখিতে কলম বাধিয়া আসিতেছে। পাষণ্ড ক্ষোভে, ক্রোধে, ক্ষিপ্ততায় সেই কোমল অঙ্গে সজোরে পদাঘাত করিল। আঘাত উদরে লাগিল। আট মাস গর্ব্ভ—প্রচণ্ড আঘাতে সেই দণ্ডে সে গর্ব্ভ বিস্রুত হইয়া পড়িল।

'মা!' দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত একটি কথা বিনির্গত হইল। রক্তের স্রোত বহিল। চক্ষের তারা কপালে উঠিল। বালিকা একবার উর্দ্ধ-পানে চাহিল, অন্তকালে একবার অন্তপুরুষের স্মরণ করিল। তার পর ইহকালের সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি স্বামীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। ধীরে ধীরে মাথা আবার সেই চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। একটি কথা কহিবার চেষ্টা করিল। কথা স্পষ্ট বাহির হইল না; তখন জিহ্বা জড়াইয়া আসিয়াছে।

অতি কষ্টে বালিকা বলিল—"স্বামী—প্রভো—স্বামী—" আর কথা ফুটিল না। জগৎ অন্ধকারময় হইয়া আসিল, সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিল। চক্ষু মুদ্রিত হইয়া পড়িল।

'স্বামী স্বামী' বলিতে বলিতে সতী সাধ্বী স্বামীচরণে মাথা রাখিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিতা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আজ ৩ দিন হইল, সুকুমারীর পবিত্র নাম এ পাপজগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। নির্ম্মলের কোনও উদ্দেশ নাই। বৃদ্ধার পীড়া আরো কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান বাসায় একাকী। মধ্যে মধ্যে কবিরাজের বাড়ী যায়, মধ্যে মধ্যে রোগীর সেবা করে, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদে।

একদিন ভগবান কবিরাজের বাড়ী গিয়াছে, কবিরাজ তখন বেলা আট্টা হইলেও আফিমের প্রসাদে ঘোর নিদ্রা ভুঞ্জিতেছিলেন, হঠাৎ একটা উড়ে বেহারা একখানি খবরের কাগজ দিয়া গেল। একা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, আগ্রহের সহিত ভগবান সে কাগজখানি দেখিল। দেখিল সর্ব্বনাশ! তাহার একস্থানে লেখা আছে—"সোমবার রাত্রি ৩ টার সময়—গলিতে যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়া যায়, পুলিষ অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ধরিয়াছে। হতভাগ্য এখন হাজতে আছে। মোকর্দ্দমা সেশনে অর্পিত হইয়াছে।"—সর্ব্বনাশ! ভগবান আর বসিতে পারিল না। দৌড়িয়া বাড়ী গেল। কাহাকেও কিছু বলিল না; নিঃশব্দে আপনার একটি গেঁজে খুলিল। সেই গেঁজেয় ভগবানের কিছু টাকা ছিল। ভগবান দেখিল, টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এতদিন সেই তাহার উপার্জ্জিত টাকায় নির্ম্মলের সংসার চালাইয়া আসিয়াছে, বিষয়বন্ধকের কথা কাহারো নিকট বলে নাই। ভগবান দেখিল, টাকা ক্রমে ফুরাইয়া আসিয়াছে। ভগবান একটু কাঁদিল। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের নাম লইয়া উড়ানি কাঁধে করিয়া ভগবান নিকটবর্ত্তী এক উকীলের বাড়ী গেল। কাঁদিয়া তাঁহাকে সমস্ত বলিল। আপনার যে অর্থ নাই তাহাও তাঁহাকে কাঁদিয়া জানাইল। উকীল

বাবু বিশেষ ভদ্রলোক, তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। উকীল বাবু ভগবানকে যথেষ্ট সাহস দিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে হয় নির্ম্মলকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন। ভগবান তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল।

ক্রমে সে কথা পাড়ার অনেকেরই মুখে উঠিল। কথা যখন উঠিল, তখন নির্ম্মলের মাতাও তাহা শুনিলেন। সেই রোগশয্যা—সেই বধূর জন্য দারুণ শোক—তার উপর সেই সন্তানের ভাবনা, বৃদ্ধার অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল। ভগবান বড়ই দায়ে পড়িল। এক একবার উকীলের বাড়ী যাইত, আর সমস্ত দিন অনাহারে অনিদ্রায় সেই রুগ্নার শয্যায় বসিয়া তাঁহার সেবা করিত। ক্রমে মোকদ্দমা কোর্টে উঠিল। মোকদ্দমার দিন প্রাতে ভগবান আবার আসিয়া সেই উকীল বাবুর পায়ে জড়াইয়া পড়িল। এক নামজাদা কৌন্সলির সঙ্গে উকীল বাবুর বড়ই প্রণয় ছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেবও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আহারান্তে ভগবানকে সঙ্গে লইয়া উকীল বাবু সেই ব্যারিষ্টার ভবনে গমন করিলেন। তিনিও তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন সকলে একত্রে কোর্টে গেলেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। আদালতে লোক ধরে না। উপরে মহামান্যা রাজরাজেশ্বরীর মুকুট ও অসি সম্মুখে চিন্তাপ্রদীপ্ত ললাটে হস্ত রক্ষা করিয়া, রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে জজ বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে জুরীরা আপন আপন আসনে শোভা পাইতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকে বা বসিয়া গৃহশোভা

দেখিতেছিলেন, আবার অনেকে বা জজসাহেবের কোন্ দিকে বেশী ঝোঁক তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। জজ কিন্তু কিছুই বলিতেছিলেন না, কেবল নীরবে অনন্যমনা হইয়া কৌন্সলিদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। সরকারি কৌন্সলি প্রথমতঃ বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার চার্জ্জ সাব্যস্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করণানন্তর তদীয় পক্ষের জেরা লইবার পর, আসামীর কৌন্সলি উঠিয়া পুনরায় জেরা করিতে লাগিলেন। যথাসাধ্য লড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সহসা মোকদ্দমার অবস্থা ফিরাইতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের রেখা দেখা দিল। তাহা দেখিয়া, আদালতের লোকগুলা ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল। অদূরে কাঠগড়ার ভিতরে নির্ম্মলকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আদালত বড় ভীষণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। নির্ম্মলের সেই অল্পবয়স, সেই দুঃখপরিম্লান অথচ তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, সেই চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল এবং দারুণ মর্ম্মপীড়ায় সেই অধোবদনে অবিরত অজস্র ধারে অশ্রুপাত—সকলেই তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইল। আর কাহারও মুখে একটীও কথা আসিল না। ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নির্বাত ও নিস্তব্ধ হয় সেই গৃহ সেইরূপ নীরব ও নিস্তব্ধ হইল।

আসামীর ব্যারিষ্টার আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সেইরূপ বক্তৃতা তাঁহার মুখে কেহ আর কখন শুনে নাই। জজ বিশেষ চিন্তিত হইলেন, জুরীরাও চিন্তিত হইলেন। গৃহশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়া এ উহার পানে চাহিতে লাগিল। জজ অনেক ভাবিলেন, জুরীদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। জুরীগণ উঠিয়া স্বতন্ত্র গৃহে গেলেন। তথায় পরস্পর অনেক বাদানুবাদের পর ফোরম্যান আসিয়া বলিলেন, তাঁহারা

দুই দল হইতেছেন। একদল বলেন আসামী অপরাধী, আর একদল বলেন সে নিরপরাধ। জজ দেখিলেন Majority আসামীর পক্ষে। হুকুম হইল, Not guilty—বেকশুর খালাস।

আসামীর কৌন্সলি ঈষদ্ধাস্যমুখে ঘাড় নাড়িয়া জজ ও জুরীগণকে সেলাম করিলেন। হাসিতে হাসিতে গিয়া তাঁহার বন্ধু সেই উকীল-বাবুর কর মর্দ্দন করিলেন। দূরে ভগবান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বুঝাইয়া সকলই বলিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ভগবান স্বর্গ দেখিল। তখন ধীরে ধীরে যে স্থানে অবাঙ্মুখে মাটীপানে চাহিয়া নির্ম্মল দাঁড়াইয়াছিল, ভগবান তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। কিছু বলিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। ভগবানকে দেখিয়া নির্ম্মলও কাঁদিল। তাহাদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া সেই দয়ালুহৃদয় উকীল বাবু দুইজনকে আপনার গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ী বাসায় গিয়া পৌছিল। ভগবান ও নির্ম্মল নামিল, উকীল বাবু আপনার বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ছুটিয়া নির্ম্মল কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকটে গমন করিল। রুগ্নার অবস্থা তখন অতিশয় মন্দ, তথাপি মায়ের প্রাণ সে রোগ মানিল না। জোরে উঠিয়া বৃদ্ধা পুত্রকে বক্ষে ধরিল। নির্ম্মল সেই বুকে মাথা রাখিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরিতাপের অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলে, কতক্ষণ পরে নির্ম্মল ডাকিল—'মা!' সে ডাকের কেহই উত্তর দিল না। নির্ম্মল আবার কাঁদিল, আবার কাঁদিয়া ডাকিল—'মা!'

হরি হরি হরি! মা নাই! পুত্রের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে বৃদ্ধা জীবনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়াছে!

দশম পরিচ্ছেদ।

বড় ইচ্ছা ছিল আর লিখিব না। এইখানেই এ নাটকের যবনিকা নিক্ষেপ করিব। কিন্তু যখন প্রায়শ্চিত্তের কথা লিখিতে বসিয়াছি, তখন না লিখিলেও চলে না। অতএব আরও কিঞ্চিৎ লিখিব, এ নাটকের আরও একটী দৃশ্য দেখাইব।

নির্ম্মল সেই মাতার মৃত্যু দেখিয়া কোথায় পলাইয়াছে, আর তাহার সংবাদ নাই। ভগবান এক্ষণে একাকী। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই—সহায় যাঁহারা থাকিবার একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সংসারখরচে,রুগ্নার সেবায়,মোকদ্দমার খুজরা বায়ে সকলি নিঃশেষিত হইয়াছে। ভগবান এক্ষণে একাকী,—নিঃসহায়, নিঃসম্বল। সেই দয়ার আধার উকীল বাবু দয়া করিয়া ভগবানকে আপন সংসারে রাখিলেন। তিনি প্রথম হইতেই তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রভুভক্তির এরূপ পরাকাষ্ঠা তিনি আর কখন দেখেন নাই। তাহার সেই অসাধরণ গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ভগবানও তাঁহাকে হৃদয় ভরিয়া ভক্তি করিত। ভগবান প্রত্যহ কাজ করিত; প্রত্যহ কাজ করিতে করিতে নির্ম্মল, নির্ম্মলের মাতা ও নির্ম্মলের স্ত্রীর জন্য রোদন করিত।

এক দিন ভগবান বড়ই কাঁদিতেছিল, যত সব পুরাতন কথা মনে পড়ায় প্রাণটার ভিতর বড়ই কেমন করিতেছিল, কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিল না। সকলে মিলিয়া কতই প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কিছুতেই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত দিন ভগবান কিছুই খাইল না, কেবল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আপিষ হইতে আসিয়া

উকীলবাবুর কনিষ্ঠ ছোটবাবু তাহাকে. নিকটে ডাকিয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান কিছুই বলিতে পারিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লগিল। ছোটবাবু অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই ভগবান শান্ত হইল না।

তখন ছোটবাবু বলিলেন—"ভগবান, কাঁদিতেছ বটে, কিন্তু তোমার জীবন কি এমন দুঃখের? যদি দুঃখের মূর্ত্তি দেখিবে, তবে চল কাল আমাদিগের আপিষে। কত যে ভয়ানক ভয়ানক দৃশ্য দেখিবে তাহা আর কি বলিব? একজনের আবার যকৃৎ কাটিবার উপক্রম হইয়াছে, আজ দেখিয়া আসিয়াছি। চল, ভগবান, তোমায় সে সব দেখাইব। তাহা :দেখিলে আর বোধ হয় নিজের .জীবনের জন্য তুমি এত দুঃখ করিবে না।"

ছোটবাবু পাগলা গারদে কর্ম্ম করিতেন। কি জানি কি ভাবিয়া ভগবান যাইতে সম্মত হইল।

পরদিন বেলা যখন ২টা, তখন ভগবান সেই পাগলাগারদের ভিতর। কি ভীষণ স্থান! একি এই পৃথিবীর অংশ, না যমপুরের কোন নিভৃত প্রদেশস্থিত এক বিষম স্থান? ভগবান দেখিল, যথার্থ বটে—যথার্থ বটে এমন দুঃখের স্থান আর বুঝি পৃথিবীতে নাই। যেমন স্থান, ইহার অধিবাসীগণের অবস্থাও তদপেক্ষা আরও ভয়ানক! দুই হাত, দুই পা দড়ি দিয়া বাঁধা, গায়ে অজস্র বেত্রাঘাতের চিহ্ন, সেই আঘাত-স্থান হইতে কাহারও শোণিত ছুটিয়া বাহির হইতেছে; কাহারও সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে দেখিলে গা শিহরিয়া উঠে; কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই—বেদনা-বোধ নাই—কত লোক আসিতেছে যাইতেছে—লক্ষ্যমাত্র নাই—থাকিয়া থাকিয়া ভীষণ ভাবে উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ আপনার মনে বকিতে আরম্ভ করি-

তেছে। মুখ দিয়া অনবরত ছেপ পড়িতেছে, চক্ষু রক্তবর্ণ—রক্তবর্ণ সেই চক্ষু অনবরতঃ ঘুরিতেছে। সেই সকল ভয়ানক মূর্ত্তি ব্যাঘ্রের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া উচ্চ হাসি হাসিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিতেছে, আবার কখন বা বিকটরূপে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। ভগবান তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া শীহরিয়া উঠিল।

সে রামায়ণ মহাভারতে নরকের কথা পড়িয়াছিল। ভাবিল, এই বুঝি সেই ভীতিময় নরকরাজ্য, এই বুঝি সেই ভীতিময় নরকরাজ্যের ভীতিময় নারকীমুর্ত্তি। ভগবান আবার শীহরিল। শীহরিয়া দেখিল, দূরে—দূরে সেই নারকীমূর্ত্তি। ছোটবাবু যাহার কথা বলিয়াছিলেন দূরে সেই দুঃখের মূর্ত্তি। দক্ষিণদিকের পাকস্থলীর উপরিভাগ ভয়ানক লাল হইয়াছে, যকৃৎ ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে, হতভাগ্য কখন চীৎকার করিতেছে, কখন হুঙ্কার ছাড়িতেছে, কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে। স্তম্ভিত হইয়া ভগবান সেই মূর্ত্তি দেখিল। কিন্তু এ কি! একি সত্য না স্বপ্ন, না কোন্ ইন্দ্রজাল? এ যে সেই বাবু—সেই নির্ম্মল বাবু! ভগবান চিনিল। আর স্থির থাকিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল।

ভগবানকে কাঁদিতে দেখিয়া সেই উন্মাদগ্রস্ত নির্ম্মল বিকট চক্ষে বিকট ভাবে চাহিয়া বলিল— 'কে তুই—কে তুই? তুই কাঁদিস্ কেন? আর কাঁদিসনে। তুই কি নিবি? চাঁদ? দূর! চাঁদ বুঝি ভাল? সূর্য্য? না, না, তারও তেমন তেজ নয়। তবে কি? বিমলা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সুকুমারী?—সুকুমারী নিবি? ঐ যাঃ—ঐ সে পাখী হ'য়ে উড়ে গেল। অ্যাঁ, উড়ে গেল! সে যে বড় পোষ মেনেছিল; সে যে কখন এমন করে শিকল কেটে উড়ে পালাবে তা ত জান্তেম না। জান্‌লে তাকে

আরও যে ভাল করে বেঁধে রাখতেম। সুকুমারি—সুকুমারি—আমার বড় সাধের পোষা পাখী—হাঃ হাঃ হাঃ—" কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। নিঃস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া ভগবান দুইহস্তে জোরে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। বুক তখন পাঁজরায় পাঁজরায় গুঁড়া হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই হতভাগ্য উন্মাদ সহসা লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিল— "দেখ দেখ, ও কে যায়? হায়! হায়! এও যে উড়ে পালায়! মা মা, তোর নির্ম্মলকে ফেলে কোথা যাস্ মা? নির্ম্মল! নির্ম্মল! দেখ কি? যেতে দিও না। ধর ধর ধর! না, না, না—নগেন তুমি অমন করো না, আমি ও বোতল ধরিব না! ওঃ বোতলে যে ভয়ানক কালসাপ! ভয়ানক বিষ! ভয়ানক বিষ! একবার দংশন কর্লে আর বাঁচন সঙ্কট। পালাও—পালাও—পালাও। খেলে-খেলে—খেলে।" কি এক ভীষণ ত্রাসে বায়ুবিতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে হতভাগ্য চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। একবার সজোরে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, পারিল না। বন্ধনরজ্জু জোরে লাগিল, দুই একস্থান হইতে রক্ত দেখা দিল। হতভাগ্য রোদন করিয়া উঠিল।

সে দৃশ্য দেখিয়া ভগবান মাথায় হাত দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল। সেই অসংখ্য পাগলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভগবান পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল—"জগদীশ! প্রভো! দয়াময়! কেন তোমার মানুষ আপনি বুঝে না, তোমাকে বুঝিতে চায় না, না বুঝিয়া কেন এ গরল পান করে? সাধ করিয়া কেন এ কালকূট খাইয়া আপনি মজে, পরকে মজায়, তোমার সুখের রাজ্যে দুঃখ আনিয়া উপস্থিত করে? দীনবন্ধো! কবে এ পুণ্যভূমি

হইতে এ বিষবৃক্ষ নির্ম্মূলিত হইবে? কবে এ সুরারাক্ষসি এ দেশ হইতে দূর হইয়া যাইবে? কৃপাময়—" ভগবান আর ভাবিতে পারিল না, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হইয়া আসিল, সে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রাণের ভিতর যে প্রাণ তাহা অতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। ভগবান কাঁদিল। কাঁদিল আবার ভাবিল, ইহাই পাপীর নরক—ইহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

সমাপ্ত

দুটী ভাই।

"ভাইয়ের সমান আপন নাই।"

কৃত্তিবাস।

দুটী ভাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্রগ্রামের পশ্চিমধারে আম্রবাগানের ভিতর একখানি জীর্ণ কুটীর। সেই জীর্ণ কুটীর মধ্যে এক বৃন্তে দুটী ফুটন্ত স্থলপদ্মের ন্যায় দুটী ভাই সর্ব্বদা একত্রে শোভা পাইত।

জ্যেষ্ঠ অরুণচন্দ্র ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে—অতি ধীর, শান্ত, মৃদু-স্বভাব। কিরণ এই গত মাসে দ্বাদশে পদার্পণ করিয়াছে,—কিরণ কনিষ্ঠ—সুশীল, সচ্চরিত্র, প্রিয়ংবদ। দুটী ভাই এক-প্রাণ, এক-আত্মা, হরিহরের ন্যায় এক-অঙ্গ বলিলেও বুঝি অত্যুক্তি হইত না।

অরুণ কিরণকে ভালবাসে, কিরণ অরুণকে ভালবাসে। অরুণ কিরণকে ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারে না, কিরণ অরুণকে না দেখিয়া একদণ্ডের তরেও প্রাণ বাঁধিতে পারে না। জ্যেষ্ঠ প্রাণাপেক্ষা কনিষ্ঠকে স্নেহ করে, কনিষ্ঠ প্রাণপণ করিয়া জ্যেষ্ঠকে ভক্তি করে।

কত বসন্তের সুখশীতল সায়াহ্নে, কত শরতের বীতমেঘ প্রভাতে দুটী ভাই হাত ধরাধরি করিয়া অশ্বিনীকুমার-যুগলের ন্যায় সেই সকল আম্রবৃক্ষের তলায় বেড়াইয়া বেড়াইত। আবার কত নিদাঘের খর-

রৌদ্রে, কত প্রাবৃটের বজ্রবৃষ্টিবর্ষণ ঘনঘটায় সেই দুটী ভাই সংসারের দুঃখদহনে পীড়িত হইয়া একসঙ্গে রাজপথে ঘুরিয়া ফিরিত। মুহূর্ত্তের জন্য কনিষ্ঠের বিরসবদন দেখিলে জ্যেষ্ঠ অকূল পাথারে ভাসিত, মুহূর্ত্তের জন্য জ্যেষ্ঠের চিন্তাচঞ্চল মনোভাব বুঝিতে পারিলে কনিষ্ঠের প্রাণ ফাটিয়া যাইত। কদাচিৎ তাহাদিগের মধ্যে একজনের পীড়া হইলে অন্য জন দিন রাত্রি জাগিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিত। একজন না খাইলে অন্যজন খাইত না। একজন না শুইলে অন্যজন শুইত না। ছায়ার ন্যায় উভয়ে উভয়ের সহযোগী, ছায়ার ন্যায় উভয়ে উভয়ের সমসঙ্গী। অরুণ কিরণ দুটী অনাথ বালক। তাহাদিগের পিতা মাতা কেহই ছিল না।

সেই সামান্য কুটীরে অতি সামান্যভাবে দুটী ভাই বাস করে। দেখিবার জন্য মাথার উপর কেহ নাই। দারুণ কষ্টে 'আহা' বলে এমন আত্মীয় খুঁজিয়া মিলে না। সংসারের দগ্ধ মরুভূমে দুঃখের প্রচণ্ড রৌদ্রে একটিবারের জন্য বিন্দুমাত্র সান্ত্বনাবারি প্রক্ষেপ করে এমন সম্বন্ধও কাহারও সঙ্গে নাই। স্রোতের মুখে কুটার ন্যায় দুটী ভাই অনন্ত সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের পাঁচজনে দয়া ভাবিয়া মাঝে মাঝে যাহা কিছু দান করেন তাহাতেই জীবিকা একরূপ চলিয়া যায়। কোন দিন জুটিত, কোন দিন জুটিত না।

সেই গ্রামের এক প্রান্তে একটী বিদ্যালয় ছিল। তাহাদিগের বেতন দিতে হইত না। দুটী ভাই সকালে পাঠ্য পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে যাইত; আবার অপরাহ্নে ছুটী হইলে দুটীতে মিলিয়া একসাথে কুটীরে ফিরিয়া আসিত। সন্ধ্যার সময় সেই আম্রবাগানের ভিতর বেড়াইতে বেড়াইতে দুটী ভাই ফুল তুলিত, পাতা ছিঁড়িত, স্বহস্ত-রোপিত ক্ষুদ্রবৃক্ষের মূলে জলসেক করিত; আবার কখন বা দুটীতে

মিলিয়া ধীরে ধীরে গল্প করিত। সে গল্প কিসের? হয়তঃ একটি গাছ হইতে একটী ফল পড়িল—কনিষ্ঠ অমনি ব্যগ্র হইয়া জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিত—"দাদা, ফল গাছে ছিল, পড়িল কেন? কৈ, বাতাস তো নাই।" যে শক্তি-বলে সকল পদার্থ পৃথিবীর প্রতি আকর্ষিত হয়, জ্যেষ্ঠ—যেমন জানিত—ধীরে ধীরে ছোট ভাইটীকে তাহা বুঝাইয়া দিত। হয়তঃ আকাশে তারা উঠিয়াছে—কনিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিত—"দাদা, তারা কি? আকাশের ফুল—না? আকাশে কত তারা ফুটে?" জ্যেষ্ঠ যাহা পড়িয়াছিল অথবা শিক্ষকের নিকট সে সকল বিষয়ে যাহা শিখিয়াছিল, ধীরে ধীরে সেই সকল বিষয়ে গল্প করিত; একাগ্রচিত্তে ধীরমনে কনিষ্ঠ সেই সকল কথা শুনিত।

কখনও বিদ্যালয়ের গল্প হইত। হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া কখন বা উভয়ে উভয়ের যত্নপালিত বৃক্ষদুটী দেখাইয়া সেই বিষয়ে গল্প করিত। গল্প করিতে করিতে রাত্রি আসিত। তখন দুজনে কুটীরে ফিরিয়া যাইত। পড়িবার জন্য বড় ইচ্ছা হইত; কিন্তু কি করিবে, তৈল কিনিবার পয়সা কোথায়? জ্যোৎস্না রাত্রে দুজনে উঠানে বসিয়া পড়িত, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে আর তাহা হইত না। তাহারা ভাবিত, রোজই জ্যোৎস্না হয় না কেন?

রাত্রে প্রায়ই আহার জুটিত না। কিন্তু এত যে কষ্ট তথাপি কিছুতে তাহারা বিষণ্ণ হইত না। দুজনের সহবাসে দুজন সদাই প্রফুল্ল, সদাই হাস্যময়, সদাই সচ্ছন্দচিত্ত। দুটীতে এক বিছানায় শুইয়া রাত্রে যে অনুপম সুখ-নিদ্রা ভোগ করিত, তাহার নিকট কোন কষ্টই স্থান পাইত না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। দুটী ভাই একত্রে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেছে। অরুণ একটী বালকের নিকট হইতে একখানি "সীতার বনবাস" সে

দিন চাহিয়া আনিয়াছিল, তাহাই আগ্রহে পাঠ করিতেছিল। কিরণ মাঝে মাঝে আপনার পাঠ রাখিয়া সেই সকল কথা শুনিতেছিল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সীতার নির্ব্বাসনের জন্য আজ্ঞা দিতেছেন; লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করে, প্রাণ থাকিতে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন করিতে পারে না। এ দিকে সাধ্বীসতীকে নিরপরাধে অমূলক লোককলঙ্কে কেমন করিয়াই বা বনে দিয়া আসিবে? ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজভক্ত লক্ষ্মণ কেমন করিয়া সেই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পবিত্রতার পুণ্য-প্রতিমারূপিণী জনকনন্দিনীকে স্বাপদসঙ্কুল বনে বিসর্জ্জন দিবে? উভয় সঙ্কট! কিংকর্ত্তব্য বিবেচনায় অক্ষম, নিঃশব্দে নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। কতক্ষণ পরে যেন সেই দুই কর্ত্তব্যের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্বের পর প্রথম কর্ত্তব্য বিজয় লাভ করিল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে লক্ষ্মণ রামের কথায় সম্মত হইল, জ্যেষ্ঠের নিয়োগ প্রতিপালন করাই স্থির করিল।

অগ্রজ-ভক্তিপূর্ণ কিরণের হৃদয়ে সহস্র ধারায় প্রেমের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া জ্যেষ্ঠের জন্য রাজ্য-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চতুর্দ্দশবর্ষকাল অনাহারে অনিদ্রায় ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন, কিরণ তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিল, সে কথা মনে পড়িল। গদগদকণ্ঠে কিরণ বলিল—"দাদা, মানুষে কি এমন পারে?"

সে কথা শুনিয়া অরুণ বিস্মিত হইল। একবার কনিষ্ঠের সেই মুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তাহার চক্ষে দুই বিন্দু জল। সে জলবিন্দু অতি নির্ম্মল, পবিত্র, প্রেমপূর্ণ—তাহা অপার্থিব সামগ্রী। নিঃশব্দে জ্যেষ্ঠের চক্ষে এক বিন্দু প্রেমের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে একটী ছোট খাট পুলিষ থানা ছিল। একখানি আটচালা ঘর—তাহার চারিধারে প্রায় দুই বিঘা জুড়িয়া একটী ফুলের বাগান। সে বাগানে যে কেবল ফুলই ফুটিত তাহা নহে। মাঝে মাঝে রাঙা শাকের ঝাড়, লাউয়ের মাচা, গোটাকতক বেগুণগাছ এবং এক ধারে বা দুই একটা কলাগাছের সারি ইত্যাদি অনেক রকম গাছ পালা ছিল। সম্মুখে একটী বাঁশের গেট, সেই গেটের ধারে একটা প্রকাণ্ড বকুল গাছ। প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই বকুল-তলায় বসিয়া চারি পাঁচ জন লালপাগড়ি চোবেজীকে নাকিসুরে "তুলসীদাস" পাঠ করিতে শুনা যাইত।

একদিন—সন্ধ্যা হইয়াছে—সেই বকুলতলায় মহা গোল উপস্থিত। সম্মুখে চিকুট-পরণে চাপরাশ-বাঁধা-কোমরে পাকা গেঁটে বাঁশের লাঠি হাতে গ্রামের চৌকিদারমহল যোড়হস্তে দণ্ডায়মান। চোবেজী-গণ কেহবা দাঁড়ি আঁচড়াইয়া, কেহবা গোঁপ মুছড়াইয়া, কেহবা কোপ-রক্তনয়নে রুল ঘুরাইয়া, আপনাদের প্রভুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। বেচারি নিরীহ চৌকিদারমহল থরহরি কম্প, সবাই ভয়ে জড়সড়। তখন চোবেজীরা তাহাদিগকে লইয়া সেই আটচালা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। সেই ঘরের ভিতর একখানি জীর্ণ—শতস্থানে কালিপড়া টেবেলের নিকট একখানি জীর্ণ—ছারপোকার ভয়ে কাগজ-মোড়া চেয়ারে বসিয়া একটি বাবু কি লিখিতেছিলেন। বাবুটী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—গলায় পৈতার গোছা। বাবু কি বিশেষ ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সহসা বহুকণ্ঠোচ্চারিত "হুজুর" শব্দ কর্ণে পশিল। সে সম্বোধনে, তাঁহার চিত্ত ফিরিল, অহঙ্কারে বুকখানা ফুলিয়া উঠিল, একবার প্রভুত্বের

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাবুটী পদে ও কর্ত্তব্যে—দারোগা সাহেব।

দারোগা সাহেব তাঁহার অধীনস্থদিগের সহিত বড় বেশী কথা কহিতেন না, তাঁহার মেজাজ বড়ই কড়া। চৌকিদারেরা কি হুকুম হয় তাই ভাবিয়া অস্থির হইল। ক্ষণকালের জন্য সে গৃহ গভীর নিস্তব্ধ। কতক্ষণ পরে মেঘনির্ঘোষে দারোগা সাহেব বলিলেন—"যখন চৌধুরী পাড়ায় চুরি হয় তখন সেখানে কাহার পাহারা ছিল?"

সে পাড়ায় পর্য্যায়ক্রমে দুই জন প্রহরা দিত। কিন্তু চুরির ঠিক সময় নিরূপণ নাই, কাজেই তখন কাহার পাহারা কে বলিবে? জানিলেও কেহ বলিতে চাহে না। অন্যান্য চৌকিদারেরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহাদের পরম সৌভাগ্য সে রাত্রে তাহাদের পাড়ায় চোরের শুভাগমন হয় নাই। কুড়ান সর্দ্দার অনেক দিনের চৌকিদার—সে সকল মার প্যাঁচ বুঝিত; বিশেষতঃ সেই পাড়ায় সেও চৌকি দিত। কুড়ান চোরকে জানিত; কিন্তু এতক্ষণ কিছুই বলে নাই। কারণ, চোরের সহিত গোপনে তাহার কিছু বন্দোবস্ত ছিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি দারোগা সাহেবেরও এ সব বিষয়ে অসাধারণ অভিজ্ঞতা। কে জানে কি বুঝিয়া—সকলকে বিদায় দিয়া কুড়ানকে গোপনে ডাকিলেন। বিস্তর পীড়াপীড়ির পর কুড়ান ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"হুজুর, এ চোর শিউপ্রসাদ চোবে!"

অন্য কেহ হইলে সে কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িত। কিন্তু দারোগা সাহেব সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। গুম্ফের অন্তরাল হইতে মন্দ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভালই, তা এতক্ষণ লুকাইতেছিল কেন?"

কুড়ান হাসিয়া উত্তর করিল—"আপনার কামড়ের ভয়ে।"

দারোগা বলিলেন—"কামড়ে তো বিষ নাই, কিন্তু ছোবলের বিষ কি নামিবে?"

কুড়ান কথাটা তত তলাইয়া বুঝিতে পারিল না, দারোগার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাবু তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমাকে ফাকি দিয়ে কি হজম করিতে পারিবে? জলে বাস করিতে গেলে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিতে নাই।"

কুড়ান এতক্ষণে বুঝিল। বলিল—"আমি কি করিব—একবার চোবে ঠাকুরকে ডাকা'ন।"

তৎক্ষণাৎ শিউপ্রসাদ চোবের তলব হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে শিউপ্রসাদ হাজির হইয়া দণ্ডবৎ সেলাম বাজাইল। দারোগা বড়ই রাগিয়া ছিলেন, কথা কহিলেন না।

দেখিয়া শুনিয়া চোবে বোকা বনিয়া গেল, কি বলিবে কিছুই ঠাহরিয়া না পাইয়া কুড়ানের দিকে চাহিল। কুড়ান ইঙ্গিতে সকল কথা জানাইল।

চোবে তখন যোড়হাতে বলিল—"ধর্ম্মাবতার, না বুঝিয়া এ কাজ হইয়াছে, মাপ করুন।"

দারোগা সপ্তমে চড়িলেন, বলিলেন—'আমি কিছুই করিতে পারি না, চোর গ্রেপ্তার হইয়াছে—চালান দিব।'

চোবে দায়ে পড়িল। বলিল—"আপনি আমার মা বাপ, আপনি না রাখিলে কে রাখিবে? রক্ষা করুন—"চোবে দারোগা সাহেবের পায়ে জড়াইতে গেল।

দারোগা পা সরাইয়া বলিলেন—"আমরা পুলিষের চাকর—শুধু চ'খের জলে ভুলি না।"

কুড়ান চোবেকে ইঙ্গিত করিল। চোবে তখন বলিল—"আজ্ঞা করুন এ গোলাম যাহা কিছু আনিয়াছে, এখনই আপনার নিকটে হাজির করি—সে সকলি আপনারই, অনুগ্রহ করিয়া পরিশ্রমের জন্য যাহা কিছু দিবেন তাহাই আমার যথেষ্ট।"

দারোগার কোপ শান্তি হইল। এক কথায় যেন আগুনে জল পড়িল। দারোগা বলিলেন—"বস্ বস্, ভয় নাই।"

শিউ প্রসাদ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দৌড়িয়া তাহার চৌর্য্যলব্ধ দ্রব্যাদি আনিতে গেল।

দারোগা বলিলেন—"থাক, সে সব সন্ধ্যার পর হইবে। কিন্তু কথাটা ভাবিতেছি কি, বড় গোল হ'য়েছে; যদি ইনস্পেক্‌টার জানিতে পারে বড় ব্যাঘাত ঘটিবে—সেতো সেই ঘুঘু—তাকে ইহার অৰ্দ্ধেক না দিলে তো চলিবে না—এখন উপায় কি?"

দারোগা ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। তৎক্ষণাৎ কি ভাবিয়া আবার বলিলেন—"আমরা পুলিষের লোক, আমরা আর এই সামান্য একটা বিষয় সারিতে পারিব না!—কি বল?"

কুড়ান ও চোবে উভয়েই বলিল—"তাত বটেই। আপনি মনে করিলে না পারেন কি? আপনার কাছে কি ইনেপেক্টার!"

হৃষ্ট হইয়া দারোগা বলিলেন—দেখ তোমরা এক কাজ কর—যাকে হয় একটা চোর খাড়া কর, বমাল সমেত একটা চোর হাজির করা চাই। জানি কি, ইনস্পেক্‌টার বেটা গোপনে জানিতে পারিয়া যদি গোল বাঁধায়—সাবধানের মার নাই।"

কুড়ানও চোবের পক্ষে এ নূতন নিয়োগ নয়, তাহারা এমন কাজ অনেকবার করিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল—"যে আজ্ঞা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্র—বড়ই প্রখর। সূর্য্য যেন মাথার উপর আগুণ ঢালিতেছে। বেলা আড়াই প্রহর। কার সাধ্য বাহিরে চারিদণ্ড ঘুরিয়া বেড়ায়? তপ্ত বায়ুর শিখায় দগ্ধ হইয়া সূচশলাকার ন্যায় সেই ধূলির উপর কে পদক্ষেপণ করিবে? হাটে, ঘাটে, পথে মানুষের সমাগম নাই। পাখী পর্য্যন্ত ডাকিতেছে না, গরু চরিতেছে না, গাছ পালাও বুঝি নড়িতেছে না।

একটী—একটী বালক সেই ভীষণ খররৌদ্রের তপ্তবালুকায় হাঁটিয়া যাইতেছে। পায়ে জুতা নাই, মাথায় ছাতি নাই, মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর ধুঁকিয়া পড়িতেছে। বালক ধীরপদে এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া ফিরিতেছে। কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, কেহ এক ফোটা জল দিয়া তৃষিত প্রাণ শীতল করে না;—মনের কষ্টে দারুণ চিন্তায় বালক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে।

কে ভিক্ষা দিবে? আহারের পর নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে সকলে নিদ্রা যাইতেছে, ভয়ে ভাল করিয়া ভিক্ষা চাহিতেও সাহস হয় না। কে ভিক্ষা দিবে? চাহিলেও কেহ ভিক্ষা দেয় না। "এত বেলায় ভিক্ষা কিরে বাপু" বলিয়া কেহ হাঁকাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে; কেহ বা নিত্য যার নাই তাকে কে দেবে?" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া উঠিতেছে। নিঃশব্দে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বালক অন্যত্র যাইতেছে।

ক্ষুধায় ক্রমে শরীর অবশ হইয়া পড়িতেছে; বালক এক বাড়ী গিয়া দুটী ভাত চাহিল। বাবু তামাকু সেবন করিতে করিতে আহারের

পরিতোষ-সূচক উদ্গার তুলিতেছিলেন, "কে রে গোল করে?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বারবানেরা হাঁকাইয়া দিল। অদূরে আসিয়া বালক দেখিল, সেই বাড়ীরই একটা চাকর পাত্র পূরিয়া ভাত লইয়া একটা কুকুরকে আনিয়া দিল। কুকুর যাহা পারিল খাইল, যাহা না পারিল পড়িয়া রহিল। চাকর তাহা কুড়াইয়া ফেলিয়া দিল। একটী দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া বালক তথা হইতে চলিল।

আর এক স্থানে কতকগুলি বাবু বসিয়া পয়সা লইয়া জুয়া খেলিতেছিলেন, বালক ভয়ে ভয়ে দুটী পয়সা ভিক্ষা চাহিল। একজন বলিল—"আজ আবার তোর কি?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বালক বলিল—"ছোট ভাইটীর আজ কয় দিন বড় জ্বর হইয়াছে। চিকিৎসা হওয়া দূরে থাক, কি খাইতে দিই এমন সংস্থান নাই, দুটী—দুটী পয়সা—" বলিতে বলিতে চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল।

যে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে বলিল—"আজ আর কিছু হবে না।"

বালক কি করিবে, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, নীরবে নয়নের অপাঙ্গ-দ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রু ঝরিল।

গর্জ্জন করিয়া একজন বলিল—"আবার দাঁড়া'য়ে রইলি যে।"

বালক সাহস করিয়া বলিল—"দুটী পয়সা দিন—এত পয়সা জুয়া খেলিয়া নষ্ট করিবেন, দুটী—" আর বলিতে হইল না।

তৎক্ষণাৎ সকলে মিলিয়া ক্রোধে বলিয়া উঠিল—"কি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমাদের পয়সা—আমরা যা করি—তোর কিরে ব্যাটা"—একটা পাষণ্ড উঠিয়া গিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া জোরে ধাক্কা দিল। সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

"জগদীশ্বর"—মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত একটী কথা উচ্চারণ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বালক ফিরিল।

*　　*　　*　　*　　*

আজ প্রায় একমাস হইল, কিরণের জ্বর হইয়াছে। জ্বরের যাতনায়, গায়ের জ্বালায় বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। অর্থাভাবে কয়দিন কিছুই ঔষধ পড়ে নাই, পথ্যও কিছু হয় নাই। ভাইটীকে একলা ফেলিয়া অরুণ কেমন করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবে? আবার তাহা না করিলেই বা এমন কে আছে যে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। বিশেষ আজ পীড়া বড়ই প্রবল হইয়াছে, অরুণের আরো ভয় হইল। আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঔষধের জন্য অর্থের চেষ্টায় বাহির হইল।

অনেক ক্ষণ হইল অরুণ গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে, এখনও আসে নাই। অরুণকে কিরণ কতই নিষেধ করিয়াছিল, সে তাহা শুনে নাই। এখন তাহাকে না দেখিয়া কিরণ আর এক দণ্ডের জন্যও স্থির হইতে পারিতেছে না। সে আপনার রোগের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার নিজের সে যাতনার কথা আর মনে নাই। দাদা এখনও কেন আসিল না—বেলা পড়িয়া আসিল, এখনও তাঁহার স্নানাহার হয় নাই, এই প্রচণ্ড রৌদ্র—কোথায় ঘুরিতেছেন, এই সকল ভাবিয়া তাহার শরীর যেন আরো শত গুণ জ্বলিয়া উঠিতেছে। কিরণ ভাবিতে ভাবিতে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ কাহার করুণ কণ্ঠ তাহার শ্রুতিগোচর হইল। সে স্বর শুনিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সত্যই তো এ যে সেই অরুণের কণ্ঠ! দাদা! দাদা এমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন কিসের জন্য? দাদার কি হইল? কিরণ ভাবিয়া অস্থির হইল। ক্রমেই সে স্বর নিকট হইতে

লাগিল। কিরণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, তখন তাহার হৃদয়ে যে যাতনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিকট সে পীড়ার যাতনা তুলনা হয় না। কিরণ উঠিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

দেখিল, জ্যেষ্ঠের দুই হাত দড়ি দিয়া বাঁধা, দুই দিকে দুই জন পুলিষের লোক ধরিয়াছে,—স্নান নাই, আহার নাই, পূর্ব্বের কয় রাত্রি জাগরণে কাটিয়াছে, তাহার উপর রৌদ্রে রৌদ্রে ফিরিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িযাছে, মুখ খানি শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষে অবিরল জলের ধারা পড়িতেছে—অরুণ ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় এক একবার এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে মাত্র—দেহের মধ্যে যেন তাহার প্রাণ নাই—জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন তাহার চক্ষে লোপ পাইয়াছে—ফুলিয়া ফুলিয়া অরুণ কাঁদিতেছে—আর মধ্যে মধ্যে পুলিষের দুই জন লোক কত তিরস্কার করিতেছে, কত ভয় দেখাইতেছে, কখন বা মারিবার উপক্রম পর্য্যন্ত করিতেছে।

ভাই-ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় ভাইয়ের এ অবস্থা দেখিয়া আর কতক্ষণ স্থির থাকিবে? "দাদা! দাদা!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া কিরণ অরুণের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। স্নেহে অরুণ কিরণকে ধরিয়া তুলিতে গেল—পারিল না। দুই হাত দড়ি দিয়া বদ্ধ ছিল। দুঃখের অশ্রুতে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। তখন সেই কঠোরমূর্ত্তি পুলিষের লোক দুই জন অরুণকে জোরে সেখান হইতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

কিরণ উঠিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তোমরা দাদাকে লইয়া কোথায় যাইবে? তোমাদের পায়ে পড়ি, ছাড়িয়া দাও।"

চোবে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"চোপ রও—চোট্টা আদ্‌মি—তোম্‌কো ভি পাক্‌ড়েঙ্গে।"

কিরণ কিছুই বুঝিল না। বলিল—"দাদার যে এখনও খাওয়া হয় নাই।" বালকের কণ্ঠ অশ্রুপ্রবাহে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

চোবে অরুণকে আঘাত করিয়া বলিল—"চল্—জল্দি চল্।"

কিরণ আবার বলিল—"দাদা তোমাদের কি করিয়াছেন? তোমরা কেন উঁহাকে ধরিয়াছ?"

শিউপ্রসাদ আবার বলিল—"কি করিয়াছে! চোরি করিয়াছে।"

কিরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কি বলিবে কিছুই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিল না। কতক্ষণ পরে বলিল—"তোমাদের ভুল হইয়াছে, কাহাকে ধরিতে কাহাকে ধরিয়াছ, দাদা কিছুই জানেন না, উঁহাকে ছাড়িয়া দাও।"

শিউপ্রসাদ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বলিল—"ছাড়িয়া দেবে—কিছু জানে না তো, এ মাল আসিল কোথা হইতে?"

শিউপ্রসাদ এক ছড়া হার দেখাইল। স্থির হইয়া বালক তাহা দেখিল। ইতিপূর্ব্বে চোবের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল, সেই হার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মুখে কথা সরিল না। ভাবিল,—"এ কি! দাদা—দাদা চুরি করিয়াছেন—তবে কি আমার কষ্ট দেখিয়া—কোথাও কিছু না পাইয়া শেষ এই কাজ করিয়াছেন।" এ কথা ভাবিতেও তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। চক্ষে যেন চারিদিক ধূমময় হইয়া আসিল, পৃথিবী আঁধারে ঢাকিয়া পড়িল। মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ বালক আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিল। কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কতক্ষণ পরে বলিল—"এ হার তোমরা কোথায় পাইলে?"

কুড়ান বলিল—"তোমাদের ঘরের পিছনে পাইয়াছি। আর কথা কহিও না, নহিলে তোমাকেও ধরিয়া লইয়া যাইব।" বাস্তবিক বাল-

কের কাতরতা দেখিয়া কুড়ানের মনে একটু দয়ার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত দয়া করিলে আপনাদের কার্য্য উদ্ধার হয় কৈ? তাই কুড়ান বালককে ভয় দেখাইবার জন্য বলিল—"নহিলে তোমাকেও ধরিয়া লইয়া যাইব।"

বালক সে কথায় ভয় পাইল না। বলিল—"তবে দাদাকে ছাড়িয়া দাও—আমাকেই লইয়া চল।"

সে কি! বালক বলে কি! তাহার কথা শুনিয়া কুড়ান বিস্মিত হইল। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে একবার বালকের প্রতি নিরীক্ষণ করিল। সে সরল নির্দ্দোষ মুখ ও সেই মুখে সেই কাতরতার সজল দৃষ্টি দেখিয়া কোনও কথা মুখে আসিল না। কুড়ান চোবেকে ইঙ্গিত করিল। চোবে অরুণকে জোরে টানিয়া লইয়া চলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া বালক তাহাদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"ছাড়িয়া দাও—দাদা কিছুই জানেন না, আমিই চুরি করিয়াছি—আমিই ঐখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—আমাকে বাঁধ।" বালক জ্যেষ্ঠের বন্ধন খুলিতে গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য সে দুর্দ্দান্ত পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের পাষাণকঠিন হৃদয়ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। হতবুদ্ধি হইয়া একবার এ উহার দিকে চাহিল, একবার বালকের প্রতি স্থির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিল। সে মূর্ত্তিতে সরলতা ও নির্দ্দোষিতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। কুড়ান ভাবিল, এ কি স্বপ্ন না কোন দেববালক? আবার চোবেজীর দিকে চাহিল। দেখিল, চোবে সেই বালককে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। বালক অম্লানবদনে আপনার দুই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। সে দৃশ্যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কুড়ান কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

অরুণ এতক্ষণ অধোমুখে নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এ কি প্রহেলিকা! কিরণ কেন চুরি স্বীকার করিতেছে?—তবে কি পেটের জ্বালায়—না, না না। অরুণ এত চেষ্টা করিল, সে চিন্তা কোনও মতে হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিল না। কিন্তু সে দেখিল, পুলিষ তাহাকে ছাড়িয়া বালককে বাঁধিবার উদ্যম করিতেছে। যে দৃশ্য দেখিয়া লৌহ হৃদয়ও কাঁদিয়াছে, তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ আর কতক্ষণ স্থির থাকিবে? কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এমন কাজ করিও না, ও বালক—কিছুই জানে না। আমি স্বীকার করিতেছি যে আমিই এই চুরি করিয়াছি, আমায় বাঁধিয়া লইয়া চল!" অরুণ আসিয়া চোবের নিকট আপনার হাত ছুখানি বাড়াইয়া দিল, তখনও সে হাত রজ্জুদ্বারা দৃঢ় বদ্ধ ছিল।

জ্যেষ্ঠের সে বদ্ধ হস্ত দেখিয়া কিরণ বলিল—"এ তোমাদের কি অন্যায়, এক জনের দোষে অন্য জনকে কেন কষ্ট দাও! দাদার বাঁধন খুলিয়া দাও, চল, যে চোর সে যাইতেছে।"

জ্যেষ্ঠের হৃদয় সহস্রধারে ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল, আবার একবার কনিষ্ঠের দিকে চাহিল, মনে মনে ঈশ্বরের নিকট তাহার কল্যাণ কামনা করিল। সেই পবিত্র কামনা উচ্চারণ করিতেও ছুই বিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। নিঃশব্দে সে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া, বলিল—"দেখিতেছ না, এ বালক আজ এক মাস ধরিয়া শয্যাগত, ইহার দ্বারা কি চুরি সম্ভব? কেন দেরি করিতেছ—আমি চোর—আমায় লইয়া চল।"

চোবে ও কুড়ান ভাবিল, সত্যই আর দেরি করা ভাল নয়, ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতেছে, গ্রামের পাঁচ জনে পড়িয়া যদি বাধা দেয়। তাহারা ছুইজনে কি পরামর্শ করিল। চোবে অরুণকে ধরিয়া লইয়া চলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের ন্যায় কিরণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীপুরের ফৌজদারি আদালতে আজ আর লোকের ভিড় ধরে না। ইতর ভদ্র চাষাভূষো সকলেই ক্ষুদে গাঁয়ের দুই ভা'য়ে চুরি মোকদ্দমা দেখিবার জন্য দলে দলে আসিয়া জমিতেছে। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত যাঁহার আহারের জন্য গৃহিণী হাঁড়ি কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন, তিনিও আজ দশটা না বাজিতেই নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আদালত পানে চলিতেছেন। বালকেরা খেলা ফেলিয়া দৌড়িতেছে, স্কুলের ছেলেরা বহি বগলে করিয়া ছুটিতেছে। সে দিন অনেকের ভাল করিয়া আহার হইল না, অনেকের ক্ষেতে লাঙ্গল পড়িল না, অনেক বালকের স্কুল বন্ধ হইল।

প্রকাণ্ড বাগানের উপর সেই আদালত। কোথাও বট, কোথাও অশ্বত্থ, কোথাও তিন্তিড়ী প্রভৃতি নানা বর্ণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। সেই সকল গাছের তলায় দলে দলে লোক গিয়া দাঁড়াইতেছে। কোথাও উকিল মোক্তারেরা ব্যাধের ন্যায় ফাঁদ পাতিয়া শিকারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন, কোথাও দোকানি জনতা দেখিয়া ভাল করিয়া দোকান ছাঁদিতেছে, কোথাও এক জন আসামী ভাল করিয়া তাঁহার সাক্ষীদিগকে আপনার স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা সাক্ষ্যটী অভ্যাস করাইতেছেন, কোথাও কোনও বাবু পানওয়ালীর নিকট পান লইয়া তাহার স্মিতসুন্দর মুখ খানির প্রতি চাহিতে চাহিতে এক পয়সার স্থানে চারি পয়সা দিতেছেন। নানা প্রকার লোক, নানা প্রকার কার্য্য—কেহ হাসিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ পান চিবাই-তেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে। বহু শব্দের মিশ্রণে থাকিয়া থাকিয়া একটা ভয়ানক অস্ফুট গোল উঠিতেছে।

অদূরস্থ বকুলতলায় ঘটিকাযন্ত্রে একজন চাপরাসি ঠং ঠং শব্দে এগারটা বাজাইয়া দিল। ঘর্ঘর চক্রে ডেপুটী বাবুর শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত নীরব হইল। কোন দিকে না চাহিয়াই ডেপুটী বাবু উপরে উঠিয়া পড়িলেন। ডেপুটী বাবুকে দেখবার জন্য অনেকে ঝুঁকিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে কাহারও চক্ষু সার্থক হইল, কাহারও হইল না। একজন চাষী দেখিতে না পাইয়া ক্ষুন্নমনে ফিরিতেছিল, তাহার পুত্র তাহাকে দেখিয়া বলিল—"বাবা দেখ্‌তে পাস্‌নি, আমি দেখেছি।" চাষী জিজ্ঞাসিল, "কে বল দেখি ?" তাহার পুত্র বলিল, "কেন, সেই চোর।" চাষী বলিল, "দূর—ওযে হাকিম।" পুত্র উত্তর করিল—"হাকিমেরা বুঝি এত দেরিতে আসে ? আর চোর নহিলে অমন করিয়া কারও দিকে না চাহিয়া ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিবে কেন ?" চাষী আর কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, ভ্রুকুটীর সহিত একজন কনেষ্টবল রুল ঘুরাইয়া দৃপ্তপদে সেই দিকে আসিতেছে। ভয়ে ভয়ে সে পুত্রের হাত ধরিয়া অন্য দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

বেলা যখন দুই প্রহর তখন সেই মোকদ্দমা উঠিল। দোতলা সে আদালত গৃহ, দোতলার উপর বিচার হইতেছিল। সে গৃহ ভয়ানক নিস্তব্ধ, অথচ তাহা লোকে পরিপূর্ণ। শব্দ মাত্র নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া ধীরে ধীরে উকীলের প্রশ্নের পর ধীরে ধীরে সাক্ষীরা উত্তর দিতেছিল। ডেপুটীবাবু গম্ভীর ভাবে মুখে রুমাল দিয়া একমনে আগাগোড়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। পার্শ্বে স্ব স্ব আসনে বসিয়া অপরাপর উকীল মোক্তারগণ নীরবে সে মোকদ্দমা শুনিতেছিলেন। দারোগা-প্রমুখ কনেষ্টবলগণ একে একে কেতাদুরস্ত মতে আপনাদিগের জোবানবন্দি দিতেছিল।

অদূরে কাঠগড়ার ভিতর যোড়হস্তে অরুণ মাটীপানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিঃশব্দে অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুর পর অশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, রহিয়া রহিয়া দুঃখের প্রগাঢ় নিশ্বাসে অশ্রুসিক্ত সেই বক্ষঃ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সে মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণ ফাটিয়া যায়। সে দিন সে গৃহে এমন লোক ছিল না যে এ বিষাদের মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলে নাই। রহিয়া রহিয়া সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে, রহিয়া রহিয়া সকলেরই নয়ন বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় পরিপ্লুত। অলক্ষিতে ডেপুটী বাবুর চক্ষেও দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নিঃশব্দে তাহা রুমালের প্রান্তভাগে মার্জ্জনা করিয়া অন্যত্র দৃষ্টি ফিরাইলেন।

সাক্ষীর পর সাক্ষী জবানবন্দি দিয়া গেল। শেষ হাকিম অরুণের প্রতি চাহিয়া অতি ধীরে অথচ সকলের স্পষ্টশ্রুত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"তোমার কি বলিবার আছে?"

অরুণ সেই অশ্রুপূর্ণ সরলতাময় ভাসা ভাসা চোক দুটী মেলিয়া একবার কাতর দৃষ্টে চাহিল। যে অশ্রু চক্ষে ঝুলিতেছিল তাহা ঝর ঝর করিয়া গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। কোনও কথা না কহিয়া আবার মুখ নত করিল।

ডেপুটী বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার স্বভাবকোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া পড়িল। ভাবিলেন, এই মূর্ত্তি—সাক্ষাৎ সরলতা ও নির্দ্দোষিতার মূর্ত্তি এই অপরাধে লিপ্ত! মনে মনে কত তর্ক করিলেন, কিছুতেই প্রতিকূল যুক্তি হৃদয়ে আসিল না। কিন্তু কি করিবেন? তিনি আইনের চাকর। ইংরাজের আইন প্রমাণের বশবর্ত্তী। এই প্রমাণের জন্য জানিয়া শুনিয়াও কত ঘোরনারকী দণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে, কত নির্দ্দোষী সাধুপুরুষ শাস্তি ভোগ করিতেছে,

কত রামের ধন শ্যামকে দিতে হইতেছে। ডেপুটী বাবু সব জানেন। কিন্তু তিনি আইনের চাকর। ইংরাজের আইন রাত্রিকে দিন বলিতে বলিলে তাহাই বলিতে হইবে, সাধুকে চোর বলিতে বলিলে তাহাই করিতে হইবে। তায় বালকের সাক্ষ্য নাই, সাবুদ নাই, উকীল নাই, মোক্তার নাই, সুধু চোখের জলে আর কত হইবে? ইংরাজের আইন চোখের জল ও কাতর দৃষ্টির জন্য কোনও ধারা লেখে না। ডেপুটী বাবু মহাকষ্টে পড়িলেন। এক দিকে আইন, অন্যদিকে হৃদয়। তিনি কোন্ পথাবলম্বী হইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন, আইনের নিকট হৃদয় বলি দিতে হয়। ইংরাজের আইনের বড়ই প্রতাপ। অগত্যা আইনের জয় হইল।

ডেপুটী বাবু রায় লিখিলেন। লিখিবার সময় না জানি কলম কতই কাঁদিয়াছিল। লিখিলেন—"আসামী প্রমাণে অপরাধী, তিন মাস কারাবাস।" ডেপুটী বাবু রায় লিখিলেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে শক্তি কুলাইল না, কে যেন গলা চাপিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ পরে ভগ্ন-কণ্ঠে সে রায় পাঠ করিলেন। স্থির হইয়া গৃহস্থিত তাবৎ লোক তাহা শুনিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলেরই হৃদয়ে কেমন একটা নিরাশার প্রবল বায়ু বহিল। সকলে একবার সেই বালকের দিকে চাহিল। অরুণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দণ্ডাজ্ঞা শুনিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর ঘুরিয়া আসিল, ঘূর্ণিত শরীরে সেই কাঠগড়ার রেল ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কণ্টকিত দেহে সকলে আকুল হইয়া সেই দিকে চাহিল। একজনের মুখে একটীও কথা বাহির হইল না। যে পাখা টানিতেছিল, সেও আড়ষ্টবৎ হইয়া গেল। পাখা বন্ধ হইল। সহসা যেন বায়ু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য গৃহ ভয়ানক নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল।

সহসা সেই নিস্তব্ধ গৃহ করুণকণ্ঠে পূরিয়া উঠিল। সে আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়া সে গৃহ ভেদ করিয়া আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিল। কণ্টকিত দেহে সকলে চাহিয়া দেখিলেন। সাক্ষাৎ নিরাশার খিন্ন অবয়ব—বিষাদের ছিন্ন মূর্ত্তি এক বালক কাঁদিতে কাঁদিতে সেই কাঠগড়ার দিকে ছুটিয়া আসিল। দেখিবামাত্র সকলেই বুঝিল, এই সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কিরণ ছুটিয়া আসিয়া যোড়হস্তে বলিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! এক জনের অপরাধে আর এক জনের দণ্ড দিবেন না, এ চুরি আমি করিয়াছি, যাহা দণ্ড হয় আমায় দিন।"

বালকের মুখে সেই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া সকলে একবার তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল। নির্দ্দোষ সরল বালকের প্রতি-মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসিলেন—"সত্য সত্যই তুমি চুরি করিয়াছিলে?"

নির্ভীক হৃদয়ে বালক উত্তর করিল—"হাঁ, ধর্ম্মাবতার, আমিই চুরি করিয়াছি, দাদা ইহার কিছু জানেন না, দয়া করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দিন।"

ডেপুটী বাবু আবার অরুণের দিকে চাহিলেন। অরুণ তখন অনেকটা আপনাকে সামলাইয়াছিল, তখন আর তাহার চক্ষু সে অশ্রুর প্রবল ধারায় প্লাবিত হইতেছিল না। অরুণ মুখ তুলিয়া যুক্তকরে বলিল—"মিথ্যা কথা, ধর্ম্মাবতার, মিথ্যা কথা! চোর আমি—আমার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইয়াছি; ও একে বালক তায় রোগে শীর্ণদেহ, ও ইহার কিছুই জানে না।"

সে কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ বলিল—"না—না; তা নয়, তা নয়। আমিই চোর, স্নেহের বশে উনি আমার জন্য এই কথা বলিতেছেন। অবিচার করিয়া দোষীকে ছাড়িয়া নির্দ্দোষীর দণ্ড দিবেন না।"

অরুণ বলিল—"না হুজুর, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, কাহাকে পুলিষ ধরিয়াছে? আমাকে। আমিই চোর। আমিই কারাবাসের উপ-যুক্ত পাত্র। বালকের কথা শুনিবেন না।"

বালক বলিতেছে, বালকের কথা শুনিবেন না, এ কথা বড় মিষ্ট। কিন্তু সে মিষ্টতা অনুভব করিবার সময় তখন ছিল না। সকলেই শোকে অধীর, সকলেরই চক্ষু জলভারাক্রান্ত।

অরুণ আবার বলিতে লাগিল—"আর বিলম্ব করিবেন না। কারাগারের পথ দেখাইয়া চলুন। আমার ন্যায় দোষী ব্যক্তি এ স্থানে থাকিবার উপযুক্ত নয়।"

অরুণ দুই পদ অগ্রসর হইল। দৌড়িয়া গিয়া কিরণ পথ আগুলিল। বলিল—"দাদা, আমার জন্য কেন তুমি নরকের স্থানে যাইবে? তোমার কিসের দোষ? চোর বলিয়া কি ছোট ভাইকে ঘৃণা করিয়া নিজে এই দণ্ড লইতেছ। তুমি গৃহে যাও। বাঁচি যদি, আবার তিন মাস পরে শ্রীচরণ দর্শন করিব।" আর অধিক বলিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কিরণ কাঁদিয়া উঠিল।

জ্যেষ্ঠের প্রাণ আর কতক্ষণ স্থির থাকিবে? কনিষ্ঠের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৃহের সমস্ত লোক সে কান্নার দৃশ্য দেখিয়া অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিল। উভয়ের এই ভাই-ভালবাসা দেখিয়া ডেপুটী বাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন। নিঃশব্দে রুমালের প্রান্তভাগে দুইবিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে কিরণ ক্রমেই হাঁপাইয়া পড়িল। কয় দিনের পীড়ার যন্ত্রণা ভোগের উপর অনাহারে ও অনিদ্রায় শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাতে কত ক্লেশ সহিবে? দেখিতে দেখিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিরণ নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। অলক্ষিতে মূর্চ্ছা আসিয়া

তাহার সেই অবসন্ন শরীর অধিকার করিয়া ফেলিল। মূর্চ্ছিত হইয়া কিরণ মাটীতে পড়িয়া গেল। সে অবস্থা দেখিয়া অরুণ আরও কাতর হইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বশরীরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, দেহের ভিতর যেন শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা জ্বলিল, চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, পৃথিবী অন্ধকারময় হইয়া আসিল। কি করিবে কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া, অরুণ মর্ম্মব্যথায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল।

হঠাৎ কি যেন তাহার স্মরণ হইল, কি যেন হৃত চেতনা কুড়াইয়া পাইল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল "এই বেলা—এই বেলা আমাকে কারাগারে লইয়া চলুন, বিলম্ব হইলে কিরণ জাগিবে।" অরুণ আর কিছু বলিতে পারিল না, একবার কিরণের দিকে চাহিল, অশ্রুবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িল, দুই হস্তে বক্ষঃ চাপিয়া ধরিল। বুক বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অরুণ সেই বক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাতরনয়নে একবার সকলের পানে চাহিয়া বলিল—"দোহাই ধর্ম্ম, কিরণ আমার ছেলে মানুষ, কিছুই জানে না, কোনও দোষে দোষী নয়, কিরণকে কিছু বলিও না"—পশ্চাৎ ফিরিয়া আবার কিরণের দিকে চাহিল, বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কিরণ—ভাই আমার—" আবার অরুণ কাঁদিল। আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আবার চক্ষের জলে বুক ভাসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে অরুণ সে জল মুছিল, ধীরে ধীরে কারাধ্যক্ষের হাত ধরিল।

একটী—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে মিশাইল। অরুণ আদালত হইতে বহির্গত হইল। অবাক্ হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে সকল লোকে চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়াছে। রজনী অন্ধকারময়ী। প্রকৃতি নীরব। সহসা দূর হইতে কে শব্দ করিল—"দাদা।" সে শব্দ কাতরতাপূর্ণ। তাহা হৃদয়ের মর্ম্মদ্বার ফাটিয়া বাহির হইতেছিল।

ক্রমে শব্দ নিকটে আসিল। কারাগারের বহির্দ্বারে যে প্রহরী বন্দুক হস্তে ভীমবেশে ফিরিতেছিল, সে হাঁকিল—"কোন্ হ্যায়?" সেই রুদ্রস্বরের প্রতি উত্তরে যে করুণ স্বর আসিল তাহা শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়, কিন্তু শক্তু ভোজনের কি গুণ জানি না, ইহা ভোজনে হৃদয় পর্য্যন্ত কেমন আঁটিয়া জমিয়া যায় বলিতে পারি না, প্রহরীর হৃদয় ভিজিল না। সে একবার নাগরা জুতা মস্ মস্ করিয়া গোঁপে চাড়া দিতে দিতে প্রভুত্বের রুক্ষ চাহনি চাহিয়া বলিল—"গোল মৎ করো, নিকালো হিঁয়াসে।"

বালক ভয় পাইল, বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, বল আমার দাদা কোথায়।"

প্রহরী বলিল—"তোর দাদা জাহান্নম গিয়া, তোমভি যায়েঙ্গে।"

বালক বুঝিল না, বলিল—"হ্যাঁ, আমি দাদার কাছে যাব, কোথায় ব'লে দাও, আমি যাই।"

প্রহরী দেখিল বালক দুয়ারে প্রবেশ করে, তখন তর্জ্জন করিয়া বালককে এক ধাক্কা মারিয়া বলিল—"এই বাঁদিকা বাচ্ছা, নিকালো।"

বালক ধাক্কা খাইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল, কাতরে একবার প্রহরীর পানে চাহিল, দরদরিত ধারায় বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল।

প্রহরীর ভীষণ তর্জ্জন ও বালকের করুণ ক্রন্দনে মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা বিষম গোল উঠিল। রজনী তখন দ্বিপ্রহরা, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, জীবরাজ্য

নিদ্রায় সুষুপ্ত। সে শব্দ নৈশ-সমীরণে প্রহত হইয়া ধীরে ধীরে আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। কোনও মানবীয় কর্ণ তাহা শুনিল না। কেবল নিভৃতে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া কারাধ্যক্ষ একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, বায়ুভরে সে শব্দ গিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। উন্মনা হইয়া ত্রস্তভাবে পুস্তক মুড়িয়া বাহিরে আসিলেন। তখনও সেই বালক যুক্তকরে সজলনয়নে প্রহরীর করুণা ভিক্ষা করিতেছিল, তখনও তাহার নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুর প্রবল ধারা নিপতিত হইতেছিল, মাঝে মাঝে প্রহরী আরক্তনেত্রে ভীম গর্জ্জন করিতেছিল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কারাধ্যক্ষ এ দৃশ্য দেখিলেন। বালকের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

স্থির নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি সেই বালককে চিনিলেন। চিনিলেন, সেই অগ্রজভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, ভাইময় প্রাণ কিরণচন্দ্র। চিনিবামাত্র, মধ্যাহ্নে আদালত-গৃহে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন তাহা মনে করিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া অবধি কতবার চক্ষের জলে ভাসিয়াছেন তাহাও স্মরণ হইল। কারাধ্যক্ষ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রাণ যেন কেমন করিতে লাগিল। চক্ষু জলে পুরিয়া আসিল। নিঃশব্দে সে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কারাধ্যক্ষকে দেখিবামাত্র প্রহরী অভিবাদন পূর্ব্বক দূরে দাঁড়াইল। বালক ভীতিবিহ্বল মুখখানি উপরে তুলিয়া ভীতিবিহ্বল স্বরে বলিল—"একবার—একবার দেখাও। দেখাও, আমার দাদা কোথায়?"

কারাধ্যক্ষ বালকের সেই কাতরতা দেখিয়া আকুলিত হৃদয়ে বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমার দাদা কে, তিনি কোথায় আছেন, তুমি বালক এত রাত্রে তাঁহার কেমন করিয়া সন্ধান করিবে?"

যে স্বরে এ কথা কয়টী উচ্চারিত হইল তাহা অতি কোমল, তাহা সহানুভূতিমাখান। কিরণ অনেক দিন তেমন স্বর শুনে নাই। স্বর শুনিয়া বালক একবার তাঁহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিল। কিছু বলিতে পারিল না, চক্ষের জলে দুই গণ্ড ভাসিয়া গেল।

কারাধ্যক্ষ বলিলেন—"কাঁদিও না, এস, আমার সঙ্গে এস।" তিনি তাহার হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। ধীরে ধীরে বালক তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে গমন করিল।

কিরণ ভাবিয়াছিল, তিনি বুঝি তাহার দাদার কাছে লইয়া যাইতেছেন। গৃহে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কৈ, আমার দাদা কোথায়?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন—"তোমার দাদা এখানে নাই, অনেক রাত্রি হইয়াছে, আজ এখানে ঘুমাও, পরে কাল সকালে তোমার দাদার সন্ধান করিয়া তাঁহার কাছে লইয়া যাইব।" তবু বালক শুনে না। সেই কান্না ও কেবল সেই দাদা বুলি। কারাধ্যক্ষ এত বুঝাইলেন, এত সান্ত্বনা করিলেন, কিছুতেই সে স্থির হইল না।

শেষ, তিনি আত্মগোপন করিয়া আবার একবার জিজ্ঞাসিলেন—"বলিতে পার, তোমার দাদা কোথায় আছেন?"

বালক এবার বড়ই কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কারাগারে।"

তাহা শুনিবামাত্র তিনি কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তবে আর ভাবনা কি, কারাধ্যক্ষের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা আছে, কাল সকালেই আমি তাঁহাকে বলিয়া তোমাকে তোমার দাদার কাছে লইয়া যাইব।"

সে কথায় কিরণ মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গ দেখিল, মুহূর্ত্তের জন্য সেই ভগ্ন প্রায় হৃদয় আশ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠিল। নিরতিশয় আগ্রহসহকারে বলিল—"আজ রাত্রে সেখানে যাওয়া যায় না'?"

কারাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন—"এ রাত্রে কোথায় বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইব? আজ এস, ঘুমাও; কাল ভোরে দুজনে যাইব।"

অগত্যা সে আর কিছু বলিতে পারিল না। কারাধ্যক্ষ তাহাকে টানিয়া আপন পার্শ্বে শোওয়াইলেন। কিন্তু কিরণের চক্ষে ঘুম আসিল না।

ক্রমে প্রভাত হইল, পাখী ডাকিল, রোদ উঠিল। কারাধ্যক্ষ গাত্রোত্থান করিলেন। চাহিয়া দেখেন, বালক অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া শেষ নিদ্রাগত হইয়াছে। তখনও গণ্ডস্থলে বারিধারা শুখাইয়া রহিয়াছে, তখনও ঠোঁট দুখানি ধীরে ধীরে নড়িতেছে। বালক রহিয়া রহিয়া স্বপ্নে দাদা দাদা বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। ভালবাসার এই জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এক অদ্ভুত প্রেমরসে দ্রবীভূত হইয়া পড়িল। টিপি টিপি বিছানা হইতে উঠিলেন। টিপি টিপি বাহিরে আসিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন।

* * * * *

কিরণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া একটী স্বপ্ন দেখিতেছিল। যেন সে তাহার দাদার অন্বেষণ করিতে করিতে কত নদ নদী, বন উপবন, দেশ মহাদেশ অতিক্রম করিয়া এক রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে অতি ভয়ানক স্থান। সেখানে সহোদরে সহোদরে প্রীতি নাই, কেবল অহর্নিশি বিবাদ বিসম্বাদ। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে মানে না, তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিলে সুখী হয়। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মুখ দেখে না, তাহাকে

এক পথে দেখিলে অন্য পথ দিয়া চলিয়া যায়। যে গৃহে কোনও কালে একটুও ভ্রাতৃপ্রেম ছিল, সে গৃহে গৃহিণীরা আসিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ বাঁধাইয়া দিতেছে। সকলেরই মুখে এক রব—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। কিরণ দেখিয়া শুনিয়া শীহরিয়া উঠিল।

চমকিত হইয়া কিরণ একবার ভয়ে ভয়ে আকাশের দিকে চাহিল। দেখিল, আকাশ নির্ম্মল, নির্ম্মেঘ, অতি পরিষ্কার। সেই আকাশের মধ্যস্থলে বৃহৎ চন্দ্র শোভা পাইতেছেন। তাহার কাতরতা দেখিয়া যেন সেই চন্দ্রমধ্য হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নামিয়া আসিলেন। আসিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন 'কি দেখিতেছ? এ পাপ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার, এ স্থান তোমার থাকিবার উপযুক্ত নয়। আইস আমার সঙ্গে, ঐ চন্দ্রলোকে গমন করি।' সে তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কি বলিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবার বলিলেন—'আর বিলম্ব করিও না, চলিয়া আইস।' কতক্ষণে সে যেন উত্তর করিল। বলিল, 'দাদা কোথায়? দাদাকে ফেলিয়া আমি একা কোথাও যাইব না।' তখন সেই স্বর্গীয় পুরুষ ভ্রূকুটী করিয়া উর্দ্ধে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। কিরণ দেখিল, সেই বৃহৎ চন্দ্রের পার্শ্বে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র শোভা পাইতেছে, সেই নক্ষত্রের উপর তাহার দাদার অবয়ব অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র তথায় যাইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়! সহসা কোথা হইতে ভয়ানক মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। নিবিড় ঘনান্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল। আর সে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিতে পাইল না। সে চন্দ্র অন্তর্হিত হইল। সে নক্ষত্র আঁধারে ডুবিয়া গেল। কিরণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"দাদা!"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে! যেখানে চোর ডাকাইত খুনে জালিয়াত প্রভৃতি দুষ্ট লোক বাস করে সেই কারাগারে! যেখানে তস্করের পাপ নিশ্বাস, প্রবঞ্চকের কুটিল দৃষ্টি, নরহন্তার ভীমমূর্ত্তি সদাই বিরাজমান—নরকের সেই প্রথম দ্বার স্বরূপ কারাগারে! সেখানে আনন্দের ঊষা কখন আলোক বিস্তার করে না, শান্তির সমীর কখন বহে না,হাসির জ্যোতিঃ কখন খেলে না। কেবল দুঃখের ছবি, কেবল অশান্তির কাল নিশা, কেবল নিরবচ্ছিন্ন নিরানন্দময়তা। যে দিকে তাকাও, সেই দিকেই যেন মূর্ত্তিমান পাপ দলবলে বিরাজ করিতেছে। সাধুসঙ্গ নাই, সৎপ্রসঙ্গ নাই, পুণ্যের সৌরভ কখন সেখানে ছুটে না, ঈশ্বরের পবিত্র নাম্ কখন সে দেশে উচ্চারিত হয় না। কেবল পাপের ক্রীড়া, পাপের আবর্জ্জনা। পাপের পুরীষগন্ধ!

সেই পাপ রাজ্যে যে সমস্ত হতভাগ্য জীব বাস করে তাহারা সকলেই বীভৎসাকার। কাহারও জিহ্বা যেন কালকূট বমন করিতেছে, কাহারও চক্ষু যেন অনলকণা ছুটাইতেছে, কাহারও নিশ্বাসে যেন পচা গন্ধ উঠিতেছে; কাহারও হস্ত যেন হত বালকের ধূমায়িত শোণিতে রঞ্জিত রহিয়াছে। সেই বীভৎস মূর্ত্তিগণ যেরূপ বীভৎস ভাবে খায়, শোয়, হাসে, খেলে—যে ভাবে আপনাদিগের দুঃখের জীবন অতিবাহিত করে, তাহা দেখিলে ভয় হয়, হৃৎকম্প জন্মে, সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। ঈশ্বরের সৃষ্টি যে অচিরকাল মধ্যেই ধ্বংসপুরে গমন করিবে তাহা ভাবিয়া আতঙ্কে আন্তরাত্মা আকুল হইয়া পড়ে।

দেখিতে দেখিতে এই কারাগার মধ্যে অরুণের একদিন কাটিয়া গেল। কয়েদীর পোশাকে লৌহ-রেল বেষ্টিত এক অন্ধকার গৃহে অরুণ

বসিয়া আছে। সে গৃহের অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য নাই, হৃদয় যে ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তাহার নিকট তাহা অতি সামান্য। দুঃখে হৃদয় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, চক্ষু দিয়া অবিরল তাড়িত প্রবাহ ছুটিতেছে, নিঃশ্বাসে বক্ষঃ থাকিয়া থাকিয়া স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, চিন্তায় শরীরে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। তাঁহার নিজের জন্য কিসের চিন্তা? কিরণের চিন্তাতেই হৃদয় আকুল। আহা! সেই রুগ্ন শরীর—না জানি কত কষ্ট হইতেছে, কে আহা বলিয়া দুটা সান্ত্বনার কথা কহিবে? কে ধূলা হইতে উঠাইয়া তাহার মুখে জল দিবে? কে বলিবে খাও, কে বলিবে শোও? না জানি এতক্ষণ অনাহারে অনিদ্রায় "দাদা দাদা" করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কোথায় পথে পথে ফিরিতেছে। অরুণ একমনে কেবল তাহাই ভাবিতেছেন, আর অবিরল অশ্রু-ধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে। কোথায় আসিয়াছেন, কিরূপে আছেন কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই। কখন রাত্রি হইয়াছিল কখনই বা রাত্রি পোহাইয়া দিন হইল সে দিকে দৃষ্টি নাই। আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন লোপ হইয়া গিয়াছে। পাগলের ন্যায় বসিয়া কেবল কিরণের কথা ভাবিতেছেন।

কিরণ কোন্ দিন কি ভাল কথা বলিয়াছিল—কোন্ দিনই বা সে বলে নাই?—কোন্ দিন কি চাহিয়াছিল তিনি তাহা দিতে পারেন নাই, কোন্ দিন তিনি তাহার বালকসুলভ একটু চঞ্চলতা দেখিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন আর সেই ভৎর্সনায় মর্ম্মব্যথায় কিরণ কিরূপে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিয়াছিল, কোন্ দিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আহার না জুটায় তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কিরণ কত সান্ত্বনার কথা কহিয়াছিল; কোন্ দিন বিদ্যালয় হইতে আসিয়া তাঁহাকে এক ঘণ্টার জন্য না দেখিতে পাইয়া "দাদা দাদা" করিয়া গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল—একে একে সে সকল কথা মনে হইতে লাগিল। তার

পর আদালতে বিচারের সময় কিরণের ব্যবহার—তাহাও যেন সব প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। আর প্রাণ ধৈর্য্য মানিল না, তাহা যেন ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। অরুণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বোধ লইল, যেন কিরণ আসিয়া 'দাদা দাদা' বলিয়া ডাকিতেছে। অরুণ অমনি উঠিয়া গদগদ কণ্ঠে "দাদা—ভাই আমার" বলিয়া দুই হস্ত বাড়াইয়া কিরণকে বক্ষে ধরিতে গেল। হাত লৌহরেলে ঠেকিয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণ মাথা টিপিয়া বসিয়া পড়িল।

যথার্থই কে ডাকিল "দাদা।" অরুণের কর্ণে গিয়া সে স্বর বাজিয়া উঠিল। পাছে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে অরুণ মাথা তুলিল না। আবার—আবার সেই স্বর, সেই যেন কে ডাকিল "দাদা—তোমার কিরণ আসিয়াছে, একবার মুখ তুলিয়া দেখ।"

অরুণ আপনা ভুলিয়া গেল। একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। এ কি! স্বপ্ন না সত্য? চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া পরিষ্কার দৃষ্টিতে দেখিল, তাহার গৃহের বাহিরে লৌহ-রেল ধরিয়া কিরণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার দুটী চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ দুইজনে নীরবে নিস্পন্দ শরীরে দাঁড়াইয়া রহিল, কাহারও মুখে কথা নাই, কথা কহিবার শক্তি তখন কাহারও ছিল না। দুই জনেরই চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, কে কাহাকে সান্ত্বনা করে?

কতক্ষণ পরে অরুণ কথা কহিল। বলিল, "কিরণ—ভাই আমার, কেন এ হতভাগার জন্য এখানে আসিয়াছ?" আবার অশ্রুপ্রবাহে অরুণের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

কেন আসিয়াছে—এ কথার কি উত্তর দিবে? বালক কিছুই বলিতে পারিল না। দরদর ধারায় তাহার দুই গণ্ড ভাসিতে লাগিল।

অরুণ এত চেষ্টা করিল, চোখের জল মানিল না, দরদর ধারায় গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া বলিল—"কেন শরীর মাটী করিতেছ, কেন আপনা আপনি মারা যাইতে বসিয়াছ ?"

এইবার কিরণ কথা কহিল। বলিল—"আবার ঐ কথা! তোমায় যখন হারাইলাম তখন আর বাঁচিব কিসের জন্য ?"

"ছিঃ ও কথা মুখে আনিতে নাই। ভাবনা কি, আবার তিন মাস পরে দুইজনে একত্র হইব।"

এবার কিরণ বড়ই কাঁদিল। বলিল—"দাদা, আমি তোমা ভিন্ন আর কিছু জানি না, তুমি আমাকে ভাঁড়াইও না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণ বলিল—"কেন—কেন, ভাই, আমি তোমায় ভাঁড়াইলাম কি প্রকারে ?"

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কিরণ বলিল—"এই একদিনে তোমায় যেরূপ দেখিতেছি, তিন মাস কখনই দেহ টিকিবে না।"

গদগদ স্বরে অরুণ বলিল—"প্রথম প্রথম অমন হয়, আবার ক্রমেই সব সহিয়া যায়—ক্রমে সকলই সহিয়া যাইবে।"

"বালক বলিয়া আমায় ভুলাইও না। আমি জানি, তোমার সকল কষ্ট—সকল দুঃখ সহিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাহাকে এক দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইতে, এ তিন মাস তাহার বিরহ সহিবে কেমন করিয়া ?"

কিরণ বালক, কিন্তু বালকের কথা বলে নাই! সে যাহা বলিল, তাহা অরুণের হৃদয়ে বড়ই লাগিল। অরুণ আবার কাঁদিয়া উঠিল। কিরণও অজস্রধারে কাঁদিল। তার পর বলিল—"দাদা, আমাকে, ছাড়িয়া তুমিও তিন মাস কখনই থাকিতে পারিবে না, আমিও তোমায়

না দেখিয়া এতকাল কথনই বাঁচিব না, তাই উপায় ঠাওরাইয়াছি। যদি তিন মাস এখানে থাকিতেই হইল, তবে দুই জনে থাকিব।"

কথা শুনিয়া অরুণ শীহরিয়া উঠিল। একবার বালকের দিকে চাহিল। তাহার অশ্রুসিক্ত সেই বদনমণ্ডলে স্থির প্রতিজ্ঞার ছায়া লক্ষিত হইল। অরুণ বলিল—"সে কি কথা, কিরণ! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

এবার স্পষ্টস্বরে কিরণ বলিল—"যেমন করিয়া পারি আমি এই কারাগারে আসিয়া থাকিব।"

অরুণের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার বুক গুর গুর করিতে লাগিল। অরুণ কারাগারের সকল অবস্থা ভাল করিয়া জানিত না, সে যখন তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিল তখন তাহার জ্ঞান ছিল না, এ পর্য্যন্তও সে দিকে কোনও লক্ষ্য করে নাই। তথাপি তাহার বোধ হইয়াছিল, যেন ইহার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর স্থান পৃথিবী মধ্যে আর কোথাও নাই। অরুণ শীহরিয়া উঠিয়া বলিল—"ছিঃ এমন প্রতিজ্ঞা করিও না। এ অতি ভয়ঙ্কর স্থান, এ স্থান তোমার থাকিবার নহে।"

কিরণ বলিল—"স্থান যত কেন মন্দ হউক না, তুমি যখন আছ, তখন ইহাই আমার স্বর্গ।"

স্থির হইয়া অরুণ কনিষ্ঠের কথা শুনিল। একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। তখন সূর্য্যের আলো বাড়িয়াছিল, সেই আলো ক্ষুদ্র গবাক্ষের লৌহদণ্ড ভেদ করিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়া খেলা করিতেছিল; তাহার সেই চক্ষুর অগ্রভাগে যে অশ্রুবিন্দু ঝুলিতেছিল তাহা সেই সূর্য্যকিরণের প্রতিফলনে মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অতৃপ্তলোচনে অরুণ ইহা চাহিয়া দেখিল। চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত প্রেমের উচ্ছ্বাসে পূরিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর যে প্রাণ তাহা পর্য্যন্তও যেন সে উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গেল। আপনাকে আর সামলাইয়া উঠিতে না পারিয়া, ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে প্রেমপূরিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট কাতরে কনিষ্ঠের জন্য করুণা ভিক্ষা করিল।

অরুণের সহায় সম্বল, আশ্রয়, অবলম্বন, আশা ভরসা, ধন প্রাণ সকলই সেই ভাই। ভাই ভিন্ন সে আর কাহাকে জানে না, ভাই ভিন্ন সে আর কাহাকে জানিতেও চাহে না। জগতের যাবতীয় শোভনীয় সামগ্রী এক দিকে আর তাহার ভাই এক দিকে—কিছুই সে ভাইয়ের নিকট তুল্য নহে—অরুণের প্রাণও তাহার নিকট নগণ্য মাত্র। যাহাকে দেখিবা মাত্র অরুণ সংসার ভুলিয়া যায়, ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকে না, আপনাকে ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া ভ্রাতৃপ্রেমে বিবশ হইয়া পড়ে, সেই ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করিতে করিতে হৃদয় প্রাণ যে প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? দেখিতে দেখিতে দুই গণ্ড বহিয়া ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নিঃস্পন্দ শরীরে স্থির হইয়া অরুণ দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরণও আর কিছু বলিতে পারিল না, অধোমুখে মাটী পানে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিল। মধ্যে লৌহরেল ব্যবধান থাকিলেও যেন তাহা অতিক্রম করিয়া উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া একত্রে গলিয়া গেল।

এ জগতে আসিয়া অনেকে অনেক প্রকার সুখ ভোগ করিয়াছে, কিন্তু ভাইয়ের জন্য প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নিঃশব্দ রোদনে যে সুখ, এই বালকদিগের কাছে কোনও সুখই তাহার তুল্য নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। বালকদিগের কাহারও জ্ঞান নাই,—কেবল রোদনেই নিমগ্ন। পশ্চাৎ হইতে একজন আসিয়া কিরণের গাত্র স্পর্শ করিল। বলিল—"বেলা অনেক হইয়াছে, কয়েদীরা কাজ হইতে আসিতেছে, আর বিলম্ব করিও না।"

কিরণের সংজ্ঞা নাই, কে কাহার কথা শুনে? হৃদয় ভ্রাতৃপ্রেমে গলিয়া গিয়াছে, সেই প্রেমেই তন্ময় হইয়া কিরণ নিঃস্পন্দভাবে ভাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাইয়ের জন্য অবিরল ধারায় রোদন করিতেছে; অশ্রুর সেই প্রবল স্রোতে হৃদয়ের যেন শত সহস্র শোক ধুইয়া যাইতেছে, বাহ্য জ্ঞান তখন তাহার ছিল না, সে কথা কিরণের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল না।

যে আসিয়াছিল, সে আবার একবার কিরণের গা ঠেলিল। ঠেলাটি বড় সহজ হয় নাই। বালক অশ্রুপূর্ণ সেই চক্ষে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া পশ্চাতে ফিরিল। সে ব্যক্তি বলিল—"এখানে থাকিবার আর সময় নাই। আমার সঙ্গে চলিয়া আইস।"

অকস্মাৎ মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বালকের প্রাণের ভিতর কেমন একটা ত্রাসের উদয় হইল, মুখ খানি শুকাইয়া গেল, কিছু বলিতে পারিল না, সেই বড় বড় জলে পোরা চক্ষু দুটী মেলিয়া আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল।

সহসা কারাগারের দ্বার পড়িয়া গেল। বালক আর তাহার দাদাকে দেখিতে পাইল না। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"দাদা।" গৃহের ভিতর হইতে তেমনি স্বরে অরুণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ভাই আমার!"

তখন বালক কাতরে সেই লোকটীর পানে চাহিয়া বলিল—"আর একবার—একবার দেখাও, আমি যে চোখের জলে দাদাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল—"কাল তখন আবার আসিও, আজ আর এখানে থাকিবার সময় নাই। ঐ দেখ সকল কয়েদীরা কাজ হইতে আসিতেছে। এস, আমরা এখান হইতে যাই।"

ধীরে ধীরে কিরণের হাত ধরিয়া লোকটী অগ্রসর হইল, ধীরে ধীরে কথাটি না কহিয়া কলের পুতলীর ন্যায় কিরণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিরণ কোন কথা কহিল না, তাহার কারণ, তাহার চিত্ত অন্য-দিকে আকৃষ্ট ছিল। সে একদৃষ্টে সেই সকল ভীমমূর্ত্তি কয়েদীদিগকে দেখিতেছিল। সেই বিকটাকার শ্রীভ্রষ্ট শীর্ণকায়—তাহার উপর লাঙ্গোটী পরা, কাহারো হাতে হাতকড়ি, কাহারো পায়ে বেড়ি, কাহারও পৃষ্ঠদেশ বেত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহারই মধ্যে তাহারা হাসিতেছে, বকিতেছে, আমোদ করিতেছে। দেখিয়া বালক ভাবিল, এ সব লোক কি পৃথিবীর! ভাবিতে ভাবিতে বালক আবার সেই দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। কয়েকটা কয়েদী কট্‌মট্‌ করিয়া তাহার দিকে চাহিল। ভয়ে বালকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়চকিতনেত্রে সেই দিকে চাহিতে চাহিতে কলের পুত্তলীর ন্যায় তাহার সঙ্গীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দূরে কোন্ কয়েদী বেত খাইতে খাইতে উচ্চৈ রোদন করিয়া উঠিল। বালকের কর্ণে সে রোদনধ্বনি প্রবেশ করিল। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দাদার কথা মনে পড়িল। বুঝি বা তাঁহারই কি হইল—বুঝি বা তিনিই রোদন করিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বালক পশ্চাৎ

ফিরিল। তখনও তাহার হাত সেই সঙ্গীর হাতের ভিতর ছিল, সঙ্গী জিজ্ঞাসিল—"কোথা যাও ?"

"দাদার কাছে। ছাড়িয়া দাও—একবার দেখিয়া আসি।"

"বলিয়াছি তো আজ আর দেখা হইবে না।"

"একবার—একবারের জন্য।"

"হুকুম নাই।"

"তোমার পায়ে পড়ি। একবারের জন্য দেখিতে দাও।"

লোকটী দেখিল বালককে এড়ান সহজ নহে, অথচ তাহার কাতরতা দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যায়, একটীও উচ্চ কথা বাহির হয় না। সে বড়ই দায়ে পড়িল, একবার একটু চক্ষু গরম করিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। বালকের সেই অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাতর দৃষ্টি দেখিয়া চক্ষু গরম না হইয়া তাহা জলে পূরিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিল, এ কার্য্য আমা হইতে হইবে না, একজন প্রহরী পাঠাইয়া দিয়া ইহাকে লইয়া যাই।

তখন বালককে বলিল—"তুমি স্থির হইয়া এখানে বসিয়া থাক, আমি তোমার জন্য হুকুম আনিতে যাইতেছি, আসিবামাত্র যেন এই খানেই দেখিতে পাই।" তাহার কথা শুনিয়া বালকের আনন্দের সীমা রহিল না, তাহার সেই শুষ্ক নয়নেও আনন্দের একটু জ্যোতিঃ দেখা দিল। স্থির হইয়া সে সেই খানে বসিল। সে লোক চলিয়া গেল।

তখন তাহাকে একা দেখিয়া এক একটি করিয়া অনেক কয়েদী তাহার কাছে আসিয়া বসিল। কিরণ অবনতমুখে বসিয়া একমনে রোদন করিতেছিল। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁদিতেছ কেন - তোমার কি হইয়াছে ?"

কিরণ মাথা তুলিল। সেই সকল বীভৎস মূর্ত্তি তাহার চারি পাশে! মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু বালক মনে মনে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহার জন্য সাহস বাঁধিল। সাহসে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা এখানে কতদিন আছ?"

সে কথায় কেহ বলিল এক মাস, কেহ বলিল ছয় মাস, কেহ বলিল এক বৎসর! কেহ বা তাহার অধিক অনেক কাল পর্য্যন্ত বলিল। আগ্রহের সহিত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, তুমি থাকিবে না কি?"

তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া কিরণ আশ্চর্য্য হইল। কেমন একটা ত্রাসও হইল। কিন্তু তবুও আস্তে আস্তে বলিল—"বল দেখি, তোমরা এখানে কেমন সুখে আছ?"

তাহা শুনিয়া সকলেই বলিল—"এখানে সুখ বেশ; কোনও চিন্তা নাই, দুবেলা আহারের জন্য কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না, আর পাঁচ জনে কথায় বার্ত্তায় থাকা যায় ভাল।"

দশ মিনিট পূর্ব্বে বেত্রাঘাত খাইয়া যাহার পিঠ তখন জ্বলিতেছিল, সেও বলিল—"এখানে সুখের সীমা নাই। তুমি থাকিবে?"

বালক বলিল—"থাকিব। কি করিলে এখানে থাকা যায়?"

তখন বালকের কথা শুনিয়া একবার তাহারা বিস্মিত নয়নে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি চাহিল। তখন সকলে মিলিয়া, যাহার যেমন অভিজ্ঞতা, সেই নরকপুরে আসিয়া থাকিবার সুগম পন্থা সকল বলিতে লাগিল। অবাক্ হইয়া আশঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে বালক তাহা শুনিতে লাগিল। এক জন বলিল—"যদি আমার কথা শুন, ইহার অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই—চুরি কর, বিনা পরিশ্রমে অনেক টাকা হইবে, অথচ এখানে আসিয়া থাকিতে পারিবে।"

আর একজন বলিল—"তাই যদি কর তবে চুরির চেয়ে ডাকাতি ভাল—এক রাত্রেই রাজা হইতে পারিবে। আর লোকের ঘর দোর জ্বালাইয়া যে কত আমোদ তাহা জানিতে পারিবে।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"যদি আমোদের কথা বল, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয়সুখের কাছে আর আমোদ নাই। কিন্তু তুমি বালক, তাহা না হইলে, তোমায় সতীত্বহরণের উপদেশ দিতাম।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল—"বালক বলিয়া তাহাই যেন না পার, কিন্তু আমি যাহা বলি তাহা করিয়া দেখিও দেখি। মানুষ মারার চেয়ে আমোদ আর কিছুতেই নাই। লোকে বলে খুন করিলে ফাঁসি হয়। এই তো দেখিতে দেখিতে কতগুলা খুন করিলাম, এখনও হাতের রক্ত শুখায় নাই, কিন্তু কৈ জেল ভিন্ন ত কিছুই হইল না।"

তাহার পর আরও অনেকে অনেক কথা বলিল। স্থির হইয়া বালক তাহা শুনিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে মুখ তুলিয়া তাহাদিগের পানে আর চাহিয়া দেখিতে সাহস হইল না।

এই সময়ে এক জন প্রহরী সেই দিকে আসিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র কয়েদীরা যে যাহার স্থানে উঠিয়া পলাইল। প্রহরী আসিয়া কিরণের হাত ধরিয়া উঠাইল। ভয়ে বালকের মুখ শুকাইয়া গেল। কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না। ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। থাকিয়া থাকিয়া কয়েদীদের সেই ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ও সেই ভয়ঙ্কর উক্তির কথা মনে হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে, আতঙ্কে বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। প্রহরীর সঙ্গে ধীরে ধীরে বালক আসিয়া কারাগারের বাহির হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুইটা বাজিয়াছে। তখনও মাথার উপর সূর্য্যদেব আগুন ঢালিতে-ছেন। পথের বালি বড়ই তাতিয়া উঠিয়াছে, কার সাধ্য তাহার উপর পদক্ষেপণ করে? চারি দিকে প্রচণ্ড রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পৃথিবী যেন মরুর মত হইয়াছে। পথে লোক চলে না, মাঠে গরু চরে না, আকাশে পাখী উড়ে না। গৃহস্থ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে; দোকানী দোকানের ঝাঁপ ফেলিয়াছে; পথিক পথ চলা বন্ধ করিয়াছে; ভিখারী গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছে। এই সময়ে একটী বালক রাস্তার ধারে একটী বটগাছের তলায় বসিয়া একমনে কি ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে; এত যে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ, বালকের চক্ষে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। দেহ নিতান্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখখানি বিষাদে কালি মাড়িয়া দিয়াছে; মাথায় তেল নাই, পেটে ভাত নাই, গায়ে কাপড় নাই—যেন শোকের প্রতিমূর্ত্তি লোকালয় ছাড়িয়া নীরবে বসিয়া রোদন করিতেছে। সে বালক কিরণচন্দ্র।

কিরণ অনেক ভাবিল, অনেক কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভাবিল, কাঁদিয়া ত কিছু ফল হইবে না। এখন কি উপায় করিব? আহা! দাদা না জানি এতক্ষণ কত কষ্ট পাইতেছেন! দাদার কথা মনে আসিবামাত্র আবার বালকের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। কিরণ সে জল মুছিল, মনে মনে বলিল, না আর বৃথা কাঁদিব না। এখন কি কি উপায় করিলে তাঁহার কাছে থাকা যায়? কয়েদীদিগের সেই কথা স্মরণ হইল, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। সূর্য্যদেব বুঝি বালকের কষ্ট আর দেখিতে পারিলেন না, তাই ধীরে ধীরে অন্তর্ধান হইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ অনেকে তাহা দেখিয়াও দেখিল না; অনেকে তাহাকে পাগল বলিয়া কত বিদ্রূপের হাসি হাসিল। সেই বটবৃক্ষের অনতিদূরে একখানি দোকান ঘর ছিল। দোকানী এতক্ষণ ঝাঁপ বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। নিদ্রাভঙ্গের পর ঝাঁপ খুলিয়া হাত মুখ ধুইল, তার পর হুঁকায় জল ফিরাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে সেইখানে বড় একটা গোল উঠিল। কিরণ চাহিয়া দেখিল, এক জন ভিক্ষুক সেই দোকানীর কাছে একটী পয়সা চাহিয়াছিল বলিয়া দোকানী তাহার গলায় ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। হতভাগ্য বুড়া ফকির অজস্রধারে কাঁদিতেছে, আর পড়িয়া যাওয়ায় তাহার ঝুলি হইতে ভিক্ষালব্ধ যে চাউল গুলি ছড়াইয়া গিয়াছিল একে একে তাহা খুঁটিয়া আবার ঝুলিতে তুলিতেছে। ফকিরের সে কান্নাও দোকানীর সহিল না, রাগে তাহার ঝুলি কাড়িয়া লইল। বুড়া কত কাঁদিল, কত কাকুতি মিনতি করিল, কিছুতেই দোকানী ঝুলি ফিরাইয়া দিল না, আবার গর্জ্জন করিয়া মারিতে আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়া তথা হইতে চলিয়া আসিল।

স্থির হইয়া কিরণ এ সমস্ত দেখিল। বুড়া চলিয়া যাইতেছিল, কাছে ডাকিল। বলিল—"কাঁদিও না, তোমার কি গিয়াছে, আমি দিতেছি।" বুড়া এই দুঃখের পর মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা পাইয়া বালককে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিল; কিন্তু বালক যে তাহাকে কি দিবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে দেখিল, বালকের অবস্থা তাহার অপেক্ষাও অতি হীন। যাহা হউক, বুড়া সেই বালকের কাছে বসিয়া আপনার দুঃখের কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

কিরণের মন কিন্তু সে বুড়ার কথার দিকে ছিল না, সে একমনে অন্য কি চিন্তা করিতেছিল। তখন আর চক্ষে জল ছিল না, সে একদৃষ্টে সেই দোকানের প্রতি চাহিয়াছিল। দেখিল, দোকানী একটা পাত্র হইতে কতকগুলা টাকা ও পয়সা লইয়া গণিতে আরম্ভ করিল। কতক গণা হইয়াছে, তাহা থাকে থাকে সারি দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে, কতক গণিতেছে, এমন সময়ে তাহার পুত্র আসিয়া কি কার্য্যের জন্য শীঘ্র বাড়ীর ভিতর যাইতে বলিল। দোকানী তাহার পুত্রকে অবশিষ্ট টাকা পয়সা গণিতে দিয়া দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর গেল। তাহার পুত্র তাহা গণিতে আরম্ভ করিল।

পলকহীন দৃষ্টিতে কিরণ ইহা দেখিল। একবার মনে মনে কি সঙ্কল্প করিল, একবার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন তাহাকে জোরে সেই সঙ্কল্প হইতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল; একবার শরীর শীহরিয়া উঠিল, বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া শব্দ হইল। কিরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানীর পুত্রের হাত হইতে তাহার টাকা ও পয়সা গুলি কাড়িয়া লইয়া আবার দৌড়িয়া সেই স্থানে আসিল। দোকানীর পুত্র চেঁচাইয়া উঠিল। তাহার পিতা কি কার্য্যে ছিল, তাহা শুনিতে পাইল না; তখন সে দৌড়িয়া তাহার পিতাকে সম্বাদ দিতে গেল।

কিরণ আসিয়াই সেই বুড়ার হাতে সমস্ত টাকা ও পয়সা গুলি দিয়া বলিল—"এই লও, কিন্তু আর দেরি করিও না, পালাও—এখনই পালাও।"

বালকের কার্য্য দেখিয়া ভিখারী অবাক্ হইয়া গেল, সে নিতান্ত দরিদ্র, তথাপি বলিল—"ইহাতে তোমার যে বড় মন্দ হইবে, এখনি যে উহারা আসিয়া তোমায় ধরিবে।"

বালক বলিল—"কথা কহিও না—শীঘ্র পলাও।"

ভিখারী বলিল—"আমি পলাইব, তুমি কি করিবে ?"

বালক অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রূকুটী করিল।

ভিখারী আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে পলাইয়া গেল। দূরে গিয়া একবার বালকের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, বালক তেমনি সেই একই স্থানে নীরবে নিষ্কম্প ভাবে বসিয়া রহিয়াছে।

দূরে কি একটা কলরব উঠিল। ভয়চকিতনেত্রে ভিখারী একবার আপনার চারিদিকে চাহিল। দেখিল, দূর হইতে সেই দোকানী ও তাহার পুত্র বহু লোক সঙ্গে 'চোর চোর' করিতে করিতে লাঠি হস্তে দৌড়িয়া আসিতেছে। দেখিয়া ভিখারী ভয় পাইল, সে আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। নিঃশব্দে একদিকে সরিয়া পড়িল।

ক্রমে দোকানীর পুত্র সেই বালকের কাছে আসিয়া 'এই চোর—এই চোর' বলিয়া হাঁকিয়া উঠিল। অনেকে তাহার কথা বিশ্বাস করিল; অনেকে করিল না। চোর কি আবার চুরি করিয়া এমন রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ? কেহ বলিল—"ও চিনিতে পারে নাই, সে পলাইয়াছে।" কেহ বলিল—"এর মধ্যেই বা পলাইবে কোথায় ?" কেহ বা বলিল "হতেও পারে এই চোর।" তাহারই কথা ধরিয়া আর একজন বলিল—"আসল বদমায়েসের ভেক বুঝা ভার।"

তখন নানা মুনির নানা মতে সিদ্ধান্ত হইল, হতেও পারে এই চোর। যে চোর সে এতক্ষণ চুপ করিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সে উঠিয়া বলিল—"যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক কথা—আমিই চোর, আমায় বাঁধিয়া পুলিশে লইয়া চল।" তখন সকলে একবার মুখচাওয়াচাওয়ি করিল; কি জানি কেন, কেহই সে অঙ্গে লাঠির আঘাত করিতে পারিল না। সকলে মিলিয়া বালককে ধরিয়া হাতে হাতে বাঁধিল।

পরদিন আদালত-গৃহে সেই ডেপুটী বাবুর সমক্ষে বালকের বিচার হইয়া গেল। আদালতের সকলেই বালককে দেখিবা মাত্র চিনিল। সকলের হৃদয় বিস্ময়ে ডুবিয়া গেল। সেই বালক—সেই সাক্ষাৎ সরলতা ও নির্দ্দোষিতার প্রতিমূর্ত্তি—সেই কিনা আবার চুরির অপরাধে অপরাধী! একি প্রহেলিকা!

মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া সকলে বালকের দিকে চাহিল। সেই সরল ও নির্দ্দোষ অবয়ব স্থির, নিশ্চল, অকম্পিত। সে দিনের ন্যায় সেই চক্ষু জলে ভাসিতেছে না, সে দিনের ন্যায় সেই বক্ষঃ নিশ্বাসে ফুলিয়া উঠিতেছে না। সে মুখে সে বিষাদের কালিমাচিহ্ন আর তেমন নাই, তাহা যেন কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব হর্ষের রেখাপাতে লুক্কায়িত ভাবে জ্বলিতেছে। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সকলে ইহা দেখিল। গম্ভীরে সকলে একবার ডেপুটী বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

ডেপুটী বাবুও এতক্ষণ নীরবে বালকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারও হৃদয় সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু, বালক নিজের জন্য কিছুই বলে না। সেই চোর—সেই দোকানীর পুত্রের হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়াছে—এই কথা ভিন্ন তাহার মুখে অন্য কথা নাই। টাকা কেন লইল—তাহা লইয়া কি করিল তাহাও বলিতে চাহে না। ডেপুটী বাবু অনেক ভাবিলেন, অনেক চিন্তা করিলেন। শেষে বাধ্য হইয়া রায় লিখিতে হইল—বালক দোষী, তাহার তিন মাস কারাদণ্ড।

নিঃশব্দে বালক সে দণ্ডাজ্ঞা শুনিল। মস্তকের একটীও কেশ কম্পিত হইল না, চক্ষের অগ্রভাগে এক বিন্দু অশ্রুও দেখা দিল না। নিঃশব্দে নিষ্কম্প হৃদয়ে রক্ষীপরিবেষ্টিত হইয়া কারাগারে চলিল। সকল লোক অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়। আবার দিন আসে, আবার দিন চলিয়া যায়। কিন্তু অবস্থার সঙ্গে সময়ের কেমন বিচিত্র সম্বন্ধ—অবস্থার জন্য দিন কখন দেখিতে না দেখিতে চলিয়া যায়, আবার কখন বা কত কষ্টেও দিন কাটিয়াও কাটে না। যে দিন কিরণ অরুণের সঙ্গে দিনান্তের শাকান্ন আহারের পর দুই জনে দুই জনের হাত ধরাধরি করিয়া অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইত, কত গল্প করিত, কত আনন্দের উচ্চ হাসি হাসিত, তৃণশয্যার উপর দুই জনে শুইয়া কত সুখ-স্বপ্ন দর্শন করিত, সে দিন কেমন চুপে চুপে দেখিতে না দেখিতে কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত। আর আজ?—আজ কিরণই বা কোথায় আর অরুণই বা কোথায়!

সে হাসির জ্যোৎস্না নিভিয়া গিয়াছে, সে সুখের বসন্ত ফুরাইয়াছে, সে আনন্দের খেলানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দুই জনের বিরহে দুই জনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে—কিরণ এত চেষ্টা করিল, দুষ্কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম ভাবিল না, পাপকে পাপ জ্ঞান করিল না, কিন্তু কৈ, দাদাকে দেখিতে পাইল কৈ? কারাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বালক কত আশা করিয়াছিল, তাহার ত কিছুই পূরিল না। কারাগারে আসিয়া যে তাহার দাদা এক ঘরে আর সে অন্য ঘরে থাকিবে ইহা সে স্বপ্নেও জানিত না। বরং এখানে না আসিলে বুঝি মাঝে মাঝে দেখা হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আজ পাঁচ দিন—অতি কষ্টকর, যন্ত্রণাময়, কাল-ব্যাপী পাঁচ দিন—কিরণ কারাগারে আসিয়াছে, কিরণ একদিনও দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। আজ পাঁচ দিন গিয়াছে, কিন্তু কিরণের পক্ষে যেন কত কষ্টের পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে।

কিন্তু তবু তো দিন থাকে না। সুখের হউক, দুঃখের হউক, দিনের পর দিন আসে, আবার দিন চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে কারাগারে কিরণের এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বালক কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবে, কাঁদে, আর চক্ষের জলে ভাসে। দাদার চিন্তার উপর মাঝে মাঝে কৃতপাপের জন্য আত্মগ্লানি আসিয়া মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, বালক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে, দুই চক্ষে হাত দিয়া কেবল অজস্রধারে কাঁদিতে থাকে।

মাঝে মাঝে দুই একটা কয়েদী তাহার গৃহের দিকে আসে, বালক সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চক্ষে দেখিতে পারে না, ভয়ে চক্ষু বুজায়। গৃহের বাহির হয় না, খায় না, শোয় না, যেখানকার ভাতের থালা সেখানেই পড়িয়া থাকে, যেখানকার বিছানা সেইখানেই পাতা থাকে। কারাধ্যক্ষ সাক্ষাতে পারেন না, গোপনে গোপনে সেই দুই বালককে এত যত্নে ও স্বচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা সুস্থ হয় না। তিনি পূর্ব্বপরিচিতের বেশে মাঝে মাঝে কিরণের নিকট গিয়া কত বুঝাইতেন, কত সান্ত্বনা করিতেন। বালক কথা কহিত না, কেবল সেই বড় বড় চক্ষু দুটী মেলিয়া তাঁহার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত, আর অশ্রুর প্রবল ধারায় দুই গণ্ড ভাসিয়া যাইত।

দশ দিনের দিন বালকের ভয়ানক জ্বর হইল। একদিনের জ্বরেই বালক অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িল। গায়ের তাতে তাহার উপর হাত দেওয়া যায় না, ডাকিলে কথা কয় না, একবারও চক্ষু মেলিয়া চাহে না, অনেকবার ডাকিতে ডাকিতে 'দাদা' বলিয়া একবার পাশ ফিরিয়া শোয়। কারাধ্যক্ষ ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার আসিয়া অনেকক্ষণ নাড়ী টিপিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"বড় সোজা দেখিতেছি না।" কারাধ্যক্ষ সাধ্যমত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সেই রাত্রে বালকের বিকার হইল। আবার ডাক্তার আসিলেন, আবার নূতন ঔষধ দিলেন। কারাধ্যক্ষ নিজে বালকের শিয়রে বসিয়া তাহাকে নিয়মমত ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রাত্রি দুইটার সময় বালক প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। প্রলাপে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন "দাদা দাদা" বলিয়া ঝাঁকিয়া উঠে। কারাধ্যক্ষ—আহা এমনি কারাধ্যক্ষ যদি সকলেই হইত!—বালকের সে অবস্থা আর দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল। নিঃশব্দে সে অশ্রু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে উঠিয়া অরুণের গৃহে গমন করিলেন।

সেই গভীর রাত্রি, পৃথিবী নিদ্রায় বিচেতন, পশু পক্ষীরও সাড়া শব্দ নাই, সেই সময়ে সেই গৃহে গিয়া কারাধ্যক্ষ যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, যেখানকার বিছানা সেই খানে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই নিভৃত কক্ষের এক প্রান্তে বসিয়া অরুণ মাথায় হাত দিয়া কেবল ভাবিতেছে, আর নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অরুণের গাত্র স্পর্শ করিলেন।

চমকিয়া উঠিয়া অরুণ চাহিয়া দেখিল। সে কারাধ্যক্ষকে চিনিত, বলিল—"আপনি! এত রাত্রে আপনি এখানে!"

"শুন, বলিতেছি" বলিয়া কারাধ্যক্ষ বলিতে লাগিলেন—"আজ দশ দিন হইল, তোমার ভাই এই কারাগারে আসিয়াছে, আজ—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে অরুণ অমঙ্গল স্বপ্নদর্শনে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কিরণ—কিরণ কারাগারে!"

"হাঁ, চুপ কর, আরও অশুভ সম্বাদ আছে। তাহার বড় জ্বর—বিকার উপস্থিত, তাই তোমায় ডাকিতে আসিয়াছি। এস, দেখিবে, এস।"

"বিকার !—বিকার হইয়াছে—কিরণ আমার বাঁচিবে তো !" অরুণ আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল ; পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া, কারাধ্যক্ষের চক্ষে জল আসিল ; নিঃশব্দে সে জল মুছিয়া তিনি বলিলেন—"অমন করিয়া কাঁদিলে সেখানে লইয়া যাইব না, চুপ করিয়া আমার সঙ্গে এস।"

অরুণ ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিল। বসিয়া ছিল, কারাধ্যক্ষের সঙ্গে যাইবার জন্য জোরে দাঁড়াইয়া উঠিল। গা ঠক্ ঠক্ করিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। কারাধ্যক্ষ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে কিরণের গৃহে লইয়া গেলেন।

কিরণ এতক্ষণ কখনও চুপ করিয়া শুইয়া কখন বা হস্তপদ অস্ফালন করিয়া, কখন বা বিকৃত চক্ষু আরও বিকৃত করিয়া নানা প্রকার প্রলাপ বকিতেছিল। যখন কিরণকে লইয়া কারাধ্যক্ষ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সে আপন মনেই প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে একবার 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

"ভাই আমার" বলিয়া অরুণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া কিরণের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিরণ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, চব্বিশ ঘণ্টার পর বালক এই প্রথম চক্ষু মেলিল। দুই বিন্দু অশ্রু সে চক্ষের কোণে গড়াইয়া পড়িল।

"কিরণ—কিরণ—এই যে আমি" বলিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়া অরুণ পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

কারাধ্যক্ষ আর সে দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু, জলে আঁধার হইয়া গেল, নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দিনে দিনে একটু একটু করিয়া কিরণ সারিতে লাগিল। ডাক্তারের চিকিৎসায় যাহা না হইল, অরুণের দর্শনে তাহার শতগুণ কার্য্য হইল। অরুণ কখন আসে কখন যায়, তাহা কারাগারের অন্য কেহ জানে না। কারাধ্যক্ষ প্রত্যহ রাত্রে তাহাকে কিরণের নিকট লইয়া আসেন, আবার রাত্রি প্রভাত না হইতেই তাহাকে তাহার নিজের ঘরে রাখিয়া আসেন। অরুণ প্রত্যহ আসিয়া বালকের মাথা আপনার কোলের উপর রাখিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করে।

ক্রমে কিরণের চৈতন্য হইল, দাদাকে মাথার কাছে দেখিয়া এক দিন কত কাঁদিল, তার পর এক দিন উঠিয়া বসিয়া দাদার সঙ্গে কথা কহিল। সে রাত্রি তাহার জাগিয়া কাটাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাছে রাত্রি জাগিলে অসুখ বাড়ে এই আশঙ্কায় অরুণ তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া শোওয়াইল।

তার পর হইতে প্রভাত হইলেই বালকেরা অকুল সাগরে ভাসিত, কখন রাত্রি আসিবে তাহার জন্য আকুল হইত, এবং কোন দিন হাসি, কোন দিন কান্না, কোন দিন গল্প, এইরূপে দুই ভাইয়ের সেই কারাগারে রাত্রি কাটিত। কারাধ্যক্ষ অরুণকে কিরণের নিকট দিয়া আর তথায় থাকিতেন না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিতেন। দিনে দিনে একটু একটু করিয়া কিরণ সারিতে লাগিল।

এক দিন—তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট অন্ধকার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অরুণ কিরণের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া আপন গৃহে বসিয়া ভাবিতেছে, সহসা ভয়ানক একটা গোল উঠিল। অরুণ চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল, প্রথম বিশেষ কিছু বুঝিতে

পারে নাই। আবার সেই গোল উঠিল। ক্রমে তাহা আরও ভীষণ হইল। অরুণ স্থির হইয়া তাহা শুনিল। 'যেন সেই কারাগারের মধ্যেই সে গোল উঠিতেছে। অরুণ বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহা অতি ভীষণ দৃশ্য।

দেখিল, কারাগারের দ্বারে দ্বারে, গবাক্ষে গবাক্ষে ভীষণ আগুন জ্বলিতেছে। ধূধূ করিয়া সমস্ত গৃহ পুড়িতেছে, আর কারাগারের তাবৎ প্রাণী হাহাকার করিতে করিতে দৌড়িয়া সে গৃহের বাহির হইতেছে। কয়েদীরা পলাইতেছে, কে বারণ করে? দ্বারে প্রহরী নাই, অনেকক্ষণ পূর্ব্বে সে পলাইয়াছে। অরুণ দেখিল, তখন কারাগারে আর প্রায় লোক নাই। যাহারা তখনও ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে শশব্যস্তে দৌড়িতেছে। কে প্রহরী, কে কয়েদী তাহার স্থির নাই। প্রহরী ও কয়েদী এক সঙ্গে মিলিয়াই পালাইতেছে।

অরুণ একবার মাথার উপরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, আলোয় আলোময়। সেই আলোর উপর কেবল ভস্ম ও ধূম উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে তাহা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। দেখিয়া অরুণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। এমন সময়ে একজন কয়েদী আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত দিল। বলিল—"দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? শীঘ্র এস, পালাই।"

অরুণ তখনও ভাল করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহাকে বলিল—"আমি যাইব—কিরণ!"

কয়েদী কিরণকে জানিত না। বলিল—"তাহারা অনেকক্ষণ গিয়াছে। এস, আর দেরি করিলে মারা পড়িবে।" এই বলিয়া কয়েদী তাহার হাত ধরিয়া দৌড়িল। অরুণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া কারাগারের বাহির হইল।

বাহিরে অসংখ্য লোক। দারোগা, কন্‌ষ্টেবল, ইনস্পেকৃটর প্রভৃতি পুলিশের তাবৎ লোক রৈ রৈ করিতেছে। তাহার সঙ্গে দোকানী পশারী বালক বৃদ্ধ অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছে। ডেপুটী বাবুও সেখানে আসিয়াছেন। কেমন করিয়া আগুন লাগিল, কখন আগুন লাগিল সে বিষয় লইয়া সকলে গোল করিতেছে, কেহই ঠিক্ বলিতে পারিতেছে না। পাছে কোনও কয়েদী সট্‌কিয়া পলাইয়া যায় এই জন্য কনেষ্টবলেরা চারিদিকে ফিরিতেছে, ও যাহাকে পাইতেছে সেই দলের মধ্যে কারাধ্যক্ষের নিকট লইয়া যাইতেছে।

কনেষ্টবলেরা সেই কয়েদী ও অরুণকে কারাধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেল। অরুণ আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিল, কিরণকে না দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কৈ, আমার কিরণ কোথায়?" বালকের কাতরতা দেখিয়া কারাধ্যক্ষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি মুখ ফিরাইলেন।

তখন অরুণ উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল। একবার পশ্চাতে চাহিল। দেখিল, কারাগার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে সেই দিকে দৌড়িল। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহার কার্য্য দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। তখন ডেপুটী বাবু দুইজন কনষ্টেবলকে দৌড়িয়া তাহাকে ফিরাইতে বলিলেন। কনেষ্টবলেরা তাহাকে ধরিতে পারিল না; কিন্তু সকলেই উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে সেই অগ্নিক্ষেত্রে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে কোনও কথা শুনিল না, পশ্চাতে একবারের জন্যও ফিরিয়া চাহিল না; দৌড়িয়া সেই কারাগারে প্রবেশ করিল। কণ্টকিত শরীরে সকলে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, চট্ পট্ শব্দে সমস্ত সামগ্রী পুড়িতেছে, হুহু করিয়া ধূম ও বাষ্প উঠিতেছে, এক একটা আগুনের হল্কায় গা ঝলসিয়া যাইতেছে, এক এক ঝলক ধূমমিশ্রিত ভস্ম আসিয়া চক্ষু অন্ধ করিয়া দিতেছে, কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, কোনও বিষয়ে দৃষ্টি নাই—কাঁদিতে কাঁদিতে বালক সেই কিরণের গৃহের দিকে ছুটিল। এক পা—আর এক পা—আর এক পা। অরুণ কিরণের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল। তখন মনের ভিতর কি একটা চিন্তা আসিল, বুক ধড় ধড় করিতে লাগিল, বালক থমকিয়া গৃহের দ্বারে দাঁড়াইল। দুই হস্তে চক্ষের জল মার্জ্জনা করিল। "জগদীশ্বর!" বলিয়া বালক গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

কিন্তু কৈ! কিরণ কৈ! কিরণ যে খাটে নাই! "কিরণ—কিরণ—কোথায় ভাই"—অরুণ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন সে ঘরের দুইটা জানালায় আগুন ধরিয়াছিল, তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে অরুণ খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, বালক মূর্চ্ছিত হইয়া খাটের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। আশ্বাসে বুক খানা শত হস্ত ফুলিয়া উঠিল। ডাকিল "কিরণ—কিরুণ—দাদা আমার।" কোনও উত্তর নাই। বালকের তখন সংজ্ঞা ছিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সেই চৈতন্যহীন কিরণকে বুকের ভিতর তুলিয়া লইয়া অরুণ গৃহের বাহির হইল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, চারিদিকে আগুন। উপরে আগুন জ্বলিতেছে, নীচে দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড সকল পড়িয়া জ্বলিতেছে, আশে পাশে গৃহ পুড়িতেছে। সেই সকল জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে,—ক্ষতি নাই—অরুণ একবারের জন্যও চিন্তা করিল না, বুকের ধন ভাইকে বুকে করিয়া তাহার উপর দিয়া দৌড়িল। মাঝে

মাঝে জ্বলন্ত অঙ্গার আসিয়া বাতাসে উড়িয়া গায়ের উপরে পড়িতে লাগিল, মাঝে মাঝে অগ্নিও ধূমময় হুল্কা আসিয়া দুই চোখ পুড়াইয়া দিতে লাগিল—ভ্রূক্ষেপ নাই—কোন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া, অরুণ একই ভাবে দৌড়িতে লাগিল। দৌড়িয়া দৌড়িয়া বহির্দরজায় আসিল।

তখন সে দরজা বিষম জ্বলিতেছিল। বাহিরে সকল লোকে সেই দরজার ভিতরে অরুণকে ভাই কোলে করিয়া আসিতে দেখিল। দেখিয়া সকলে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য সকলের হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোতে ডুবিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেই দরজা কি করিয়া বালক পার হইবে তাহা ভাবিয়া সকলে আকুল হইয়া পড়িল।

অরুণ একবার উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, দরজার উপরের চৌকাঠ পড় পড় হইয়াছে; এখন তাহার ভিতর দিয়া যাওয়া বড় অসমসাহসিকের কর্ম্ম,—হয়তঃ ঐ চৌকাঠের আঘাতে দুই জনকেই সেই দণ্ডে প্রাণ হারাইতে হইবে। অরুণের নিজের প্রাণের জন্য সে কাতর নহে—কিন্তু কিরণ—এত করিয়া যাহাকে আনিলাম সে কিরণের কি হইবে। তাহা ভাবিতেও অরুণ কাঁদিয়া ফেলিল।

তবে উপায়? এখন না যাইতে পারিলে আর উপায় নাই। চৌকাঠ পড়িলে দরজাও পড়িবে, তখন আর বাহির হওয়া যাইবে না। অরুণ মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত চিন্তা করিয়া একবার উপরে চাহিল। একবার বিপদে বিপদহারীকে ডাকিল। মনে দুনা বল করিল। নিমেষ মধ্যে সেই দরজার ভিতর দিয়া দৌড়িয়া অরুণ বাহিরে আসিল। জ্বলিতে জ্বলিতে চৌকাঠ পড়িয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তখন, সেই সকল লোক বালকের কার্য্য ও ঈশ্বরের মহিমার কথা ভাবিয়া এক কালে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সকলেরই হৃদয় এক অনৈসর্গিক প্রেমে ভরিয়া গেল, সকলেরই চক্ষে প্রেমের অশ্রু দেখা দিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামের শিউ প্রসাদ ও কুড়ান সর্দ্দার ছিল। তাহারা তাহার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় একটী চোর চালান দিতে আসিয়াছিল। কুড়ানের চক্ষেও সেই বালকদিগের জন্য দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার এক মাত্র সন্তান মারা গিয়াছিল, কুড়ানের সেই কথা মনে পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। হৃদয়ের ভিতরে যে হৃদয় কে যেন তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কুশ ফুটাইতে লাগিল। কুড়ান অস্থির হইয়া পড়িল। সে যেন কি এক তাড়িত বলে, যেখানে ডেপুটী বাবু প্রভৃতি সকলে নিমেষের মধ্যে সেই বালকদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ধীরে ধীরে সেই খানে আসিল। আসিয়া একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিল, একবার বালকদিগের পানে চাহিল, চক্ষের জলে দুই গণ্ড ভাসিয়া গেল, সজল নয়নে যোড়-হস্তে নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডেপুটী বাবু তাহাকে দেখিলেন, প্রথমতঃ ইন্‌স্পেক্টর ক্ষুদ্র চৌকিদার বলিয়া দূরে হাঁকাইয়া দিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ডেপুটী বাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ডাকিলেন। ধীরে ধীরে কুড়ান অগ্রসর হইয়া সজলনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে কথা সরিল না।

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "কি বলিবে বল।"

কিন্তু তখন তাহার হৃদয়ে যে যাতনা হইতেছিল, তাহা বলিবার নহে; কুড়ান কিছু বলিতে পারিল না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডেপুটী বাবু আবার বলিলেন "ভয় নাই, যাহা বলিবার থাকে স্পষ্ট করিয়া বল।"

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কুড়ান বলিল—"দোহাই ধর্ম্ম, এখনও দিন রাত্রি হইতেছে, এই দাঁড়াইয়া দেখিলাম, এখনও পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ আছেন—দোহাই ধর্ম্ম, এ বালক দুটীকে ছাড়িয়া দিন। ইহারা কোন দোষে দোষী নয়।"

তখন সেই কথা শুনিয়া সেখানকার সকলে অবাক্ হইয়া গেল। যে কুড়ান ইহার পূর্ব্বে এই বালকদিগকে চোর বলিয়া চালান দিয়াছিল, যে কুড়ান বিচারের দিনে বালকদিগকে চোর প্রমাণ করিবার জন্য কত সাক্ষ্য দিয়াছিল, সেই কুড়ানের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। বিস্মিত হইয়া সকলে বলিল—"তবে সে দিন সেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলে কেন?"

কুড়ান কথা কহিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আপনার মনে কাঁদিতে লাগিল।

তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে অভয় দিতে লাগিলেন। কুড়ান একটু শান্ত হইয়া বলিল—"আমি বড় পাপী—যে দণ্ড হয় দিন, আর আমি কোন দণ্ডে ভয় করি না, ঈশ্বর যে দণ্ড মারিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা আপনারা কি অধিক দণ্ড দিবেন!" এই বলিয়া কুড়ান আবার মৃতপুত্রের কথা স্মরণ করিয়া উচ্চে কাঁদিল। তাহার হৃদয়ের অবস্থা কাহারও বুঝিবার বাকি রহিল না। সকলে তাহাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

তখন অনেক চেষ্টায় একটু শান্ত হইয়া কুড়ান আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। স্তম্ভিত হইয়া সকলে সেই কথা শুনিতে লাগিলেন।

তখনও কুড়ানের সকল কথা বলা হয় নাই, তখনও সকলে একাগ্র-চিত্তে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই স্থানে হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক বৃদ্ধ দৌড়িয়া আসিল। আসিয়াই বুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দোহাই ধর্ম্ম, আমি কিছুই জানি না, ওরাই জোর ক'রে চোর ব'লে আমায় ধরে চালান দিয়েছে। দোহাই ধর্ম্ম, আমি বড় গরিব, আমার আর কেউ নেই।"

সেই বুড়ার কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার প্রতি চাহিল। বুড়া কাঁদিতে লাগিল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"দোহাই আপনাদের—আমি বুড়া মানুষ, পাঁচ দোরে ভিক্ষা ক'রে খাই, আমি চুরির কিছুই জানি নে।"

তখন সকলে কুড়ানকে সেই বুড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিল। কুড়ান বলিল—"কাল সন্ধ্যার সময় উহাকেই আমরা চালান দিতে আসিয়াছিলাম। ও ফকির, কিন্তু উহার নিকট এত টাকা আসিল কোথা হইতে, তাই সন্দেহ হওয়ায় চোর বলিয়া ধরিয়াছিলাম। উহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ও টাকা কোথায় পাইয়াছে তাহা বলে না।"

তখন, ডেপুটী বাবু সেই বুড়াকে বলিলেন—"তুমি কাঁদিও না, ভয় নাই; তোমায় কেহই কিছুই বলিবে না। তুমি ঠিক বল দেখি, টাকা কোথায় পাইলে।"

ডেপুটী বাবুর কথায় বুড়া কোনও উত্তর করিল না। একবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে চাহিল। হরি হরি হরি! এ কে! এ যে সেই বালক! বুড়া কিরণকে দেখিতে পাইল। তখনও বালকের মূর্চ্ছা ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই, তখনও বালক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, বুড়া সেই বালককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। চমকিয়া বলিল—"না—না, কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না—আমি কিছু বলিব না—"

বিস্ময়ের সহিত অথচ ঈষৎ রুক্ষভাবে ডেপুটী বাবু বলিলেন—"তুমি ঠিক্ না বলিলে, তোমায় আমরা ছাড়িব না। কি জান, খুলিয়া বল।"

কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়া বলিল—"বড় ভয় হয়, আপনারা বলুন, এ বালককে কিছু বলিবেন না।"

বুড়ার কথা শুনিয়া সকলে আরো বিস্মিত হইল। ডেপুটী বাবু বলিলেন—"সে কি! এ বালককে কেন কিছু বলিব? সে ভয় তোমার নাই। টাকা কোথায় পাইলে বল।"

তখন বুড়া ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা খুলিয়া বলিল। যে সেই কথা শুনিল সেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিস্মিত হইয়া সকলে একবার সেই মূর্চ্ছাপন্ন বালকের প্রতি চাহিল।

তখন সূর্য্যের তেজ বাড়িয়াছিল, সেই সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি আসিয়া বালকের মুখমণ্ডলে পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। এত যে রোগ, চিন্তা ও দুর্ভাবনায় দেহ কালি হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই সরল, নির্দ্দোষ প্রেমফুল্ল মুখ খানি ঢল ঢল করিতেছিল। স্থির হইয়া সকলে ইহা দেখিল। নিঃশব্দে সকলের নয়নকোণে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সেই অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া সকলে একবার অরুণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। এ কি এ! অরুণ যে দাঁড়াইয়া নাই! যতক্ষণ কুড়ান ও বুড়া তাহাদিগের কথা বলিতেছিল, অরুণ নীরবে নিঃস্পন্দশরীরে রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া একমনে তাহা শুনিতেছিল। অরুণ এখন আর দাঁড়াইয়া নাই। সকলে ভীতিব্যাকুল নেত্রে দেখিল, অরুণ তাহার ভ্রাতার পার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তৎক্ষণাৎ সেই ভিড় সরাইয়া দিয়া দুই বালককে ধরাধরি করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। হাঁসপাতাল অতি নিকটেই ছিল। দারোগা, ইন্‌স্পেকটর প্রভৃতি পুলিসের হস্তে কয়েদী ও কারাগারের ভার দিয়া ডেপুটীবাবু কতিপয় ভদ্রলোক সঙ্গে হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলেন। আর কেহই সেখানে যাইতে পাইল না। তবু ভিড় কমিল না। উৎসুক চিত্তে তাবৎ লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার কিরণের নাড়ী দেখিলেন। বলিলেন—"ভয় নাই, শীঘ্রই চৈতন্য হইবে।" এক চামচ ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে অরুণের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। সর্ব্বনাশ! ডাক্তার বাবু মুখ বিকৃত করিলেন। অতি সাবধানে তাহার সমস্ত অঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এ কি এ! শরীরের যেখানে হাত দেন, সেখানেই পোড়া! কোনখানে ঝলসিয়া মাংস লাল হইয়া গিয়াছে, কোনখানে পুড়িয়া উপরের ছাল উঠিয়া গিয়াছে, কোনখানে কোঁক্‌ড়াইয়া কোঁক্‌ড়াইয়া দগ্ধ চর্ম্ম জমিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া ডাক্তার শীহরিয়া উঠিলেন।

স্থির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সকলকে তাহা দেখাইলেন। সকলের শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলেরই হৃদয় বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িল।

অতি দুঃখের স্বরে ডেপুটী বাবু বলিলেন—"উপায়!"

ডাক্তার বলিলেন—"উপায় দেখি না, আশা নাই।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া সকলের চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল। সাধ্যমত ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

বেলা যখন একটা, তখন কিরণের চৈতন্য হইল। কিরণ পাশ ফিরিয়া বলিল—"দাদা"

ডাক্তার বাবু কিরণের গালে আর একবার ঔষধ দিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কিরণ উঠিয়া বসিল। উঠিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইল। বলিল—"কোথায় আমি?—দাদা কৈ?"

তখনও ডেপুটী বাবু এবং আর আর সকলে—স্নান নাই আহার নাই—সেইখানে বসিয়াছিলেন। বালকের ভাব দেখিয়া সকলেরই চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

ডেপুটী বাবু বলিলেন—"ভয় নাই, তোমার দাদার অসুখ হইয়াছে তাই তোমাদিগকে এখানে আনিয়াছি। তুমি কিছু খাবে?"

বালক কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দাদার অসুখ সারিলে দুইজনে এক সঙ্গে খাইব।"

বালক যে স্বরে এ কথা বলিল, তাহা শুনিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। সে কথা শুনিয়া সকলেই নীরবে অশ্রু মার্জ্জনা করিল।

ডেপুটী বাবু আবার বলিলেন—"তোমার দাদার অসুখ এখনই সারিবে। তুমি কিছু খাও।"

বালক কথা কহিল না। সে তখন অরুণের সর্ব্ব শরীর একদৃষ্টে দেখিতেছিল। তাহা দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইল। ভীতিব্যাকুল মুখখানি উপরে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এ কি এ! দাদার কেন এমন হইল?"

তখন ডেপুটী বাবু বলিলেন—"চুপ কর, কাঁদিও না, বলিতেছি।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে অরুণের সেই অলৌকিক কাণ্ডের কথা বলিতে লাগিলেন। কণ্টকিত শরীরে বালক চুপ করিয়া এক মনে তাহা শুনিতে লাগিল।

ডেপুটী বাবুর বলা শেষ হইল। "দাদা—দাদা—আমার জন্য তোমার এই দশা! আমি হতভাগা—" কিরণ আর বলিতে পারিল না, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে সেই ভ্রাতৃপার্শ্বে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বেলা চারিটার সময় অরুণ একবার চক্ষু মেলিল। তখন কিরণের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছিল, বালক একদৃষ্টে অরুণের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল। অরুণ অস্পষ্টভাবে তাহাকে দেখিয়া ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া ডাকিল—"কিরণ—কিরণ—ভাই আমার।"

কিরণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"এই যে দাদা, এই যে আমি।" বালকের দুই গণ্ড চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। অশ্রুসিক্ত সেই বদনমণ্ডলের প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে অরুণের চক্ষে নিঃশব্দে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল।

কিরণ উঠিয়া অরুণের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। অরুণ ভগ্ন-কণ্ঠে বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে বলিল—"কিরণ—ভাই, সাবধান। এ পৃথিবী বড় ভয়ঙ্কর স্থান, সাবধানে থাকিও, আমি যাই।"

ডাক ছাড়িয়া কিরণ কাঁদিয়া উঠিল। অরুণ চক্ষু মুদিল। কিরণ ডাকিল—"দাদা—দাদা।"

আবার অরুণ চক্ষু খুলিল, বদনমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখা দিল, একটু হাসিয়া কিরণের দিকে চাহিল। আবার চক্ষু মুদিয়া পড়িল। হাহাকার করিয়া কিরণ মাথায় কর হানিল।

একবার—একবার অরুণের মুখ বিকৃত হইল, সেই মুখে অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা দিল। বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। কণ্ঠ জোরে ফুলিয়া উঠিল। একটী—একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহিরের বায়ুর সঙ্গে মিশাইল। অরুণের জীবলীলা ফুরাইল।

কিরণ মুখের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতর-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিল। সহসা কে যেন বুকের ভিতর হইতে হৃৎপিণ্ডটা সবলে টানিয়া ছিঁড়িয়া আনিল, সেই বুকের উপর জোরে করাঘাত করিয়া, 'দাদা' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

* * * *

রজনী গভীরা। সেই গভীরা নিশায় নির্ম্মলাতটলগ্ন শ্মশান-ভূমে একটী চিতা জ্বলিতেছে। নিকটে বহু লোক দাঁড়াইয়া। সকলেরই হৃদয় শোকমগ্ন, সকলেরই চক্ষু জলভারাক্রান্ত। তার উপর শ্মশানের সেই ভীতিপূর্ণ নিস্তব্ধ গম্ভীরতায় "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" ভাবিয়া সকলেরই প্রাণ আরও উদাস হইয়া পড়িয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া সকলে এক একবার সেই চিতার দিকে চাহিতেছে, আর এক একবার অনতিদূরে যে বালক নীরবে নিঃস্পন্দ-নয়নে সেই চিতার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। বালক নীরব—নিঃস্পন্দ—চক্ষের পলক পর্য্যন্ত পড়িতেছিল না। যে চক্ষু ক্ষণপূর্ব্বে জলে ভাসিতেছিল, এখন আর তাহাতে জল নাই, বালক প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় অচলভাবে সেই একদৃষ্টে চিতার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। হুঃ হুঃ শব্দে চিতা জ্বলিতেছে। স্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া অগ্নিশিখা আকাশে উঠিতেছে। তৎপ্রতি চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে বালক একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল।

তাহার বোধ হইল, একদিন স্বপ্নে যে বৃহৎ চন্দ্র দেখিয়াছিল, আজ যেন সেই চন্দ্র আবার আকাশের মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছে। এত বড় চাঁদ সে আর কখন দেখে নাই। যেন সেই সেদিনকার মত সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ চন্দ্রমধ্য হইতে বাহির হইয়া অগ্নিশিখার ভিতর দিয়া

নামিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে যেন সেই চিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বর্গের সৌরভে দশদিক্ পূরিয়া উঠিল। স্থির হইয়া বালক সেই স্বর্গীয় পুরুষকে দেখিতে লাগিল। দেখিল, যেন, সেই পুরুষ সেই চিতা হইতে শব লইয়া বক্ষে করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরে সেই প্রকাণ্ড উজ্জ্বল নক্ষত্র আজ আবার তেমনি করিয়া চাঁদের পাশে উঠিয়াছে। নক্ষত্রের উপর তেমনি ভাবে তাহার দাদার মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। যেন তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সেই স্বর্গীয় পুরুষ ভ্রুকূটী করিয়া উঠিলেন। ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "কেন, সে দিন আসিতে পারিলে না কেন? আজ কাঁদিলে কি হইবে?" বালক ভয় পাইল, কাতরদৃষ্টে সাশ্রুলোচনে একবার সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের প্রতি চাহিল। তদ্দৃষ্টে সে পুরুষ নরম হইয়া কোমল স্বরে বলিলেন— "এখানে থাকিলেই এমনি কাঁদিতে হইবে। এস, আর একদণ্ডও অপেক্ষা করিও না।" এই বলিয়া দেখিতে না দেখিতে, চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে, চকিতে সেই আকাশসম্ভূত পুরুষ আকাশের গায়ে মিলাইয়া গেলেন।

"দাঁড়াও—দাঁড়াও আমি যাই" বলিয়া বালক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিল। তৎক্ষণাৎ তীরবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত লোক বালকের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিবার জন্য সকলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। কিন্তু কেহই সে বালককে ধরিতে পারিল না। দূর হইতে শব্দ আসিল— "দাদা—দাদা, তোমার কিরণকে ফেলিয়া যাইও না—দাদা।" আর কেহ কোনও কথা শুনিতে পাইল না। নির্ম্মলার জল কল কল করিয়া

ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি তুলিয়া উছলিয়া উছলিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেই জলে কিসের পতন শব্দ হইল। 'হায় হায়' করিয়া সকলে সেই তটে আসিয়া দাঁড়াইল। হায় হায়! সে বালক কোথায়? সারি সারি বৃক্ষশ্রেণী তটের উপর নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—যেখানকার যে লতাটি সেখানেই সেই ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে—হায় হায়! সে বালক কোথায়? সভয়ে সকলে নির্ম্মলার কাল জলের প্রতি চাহিল। তখনও জলে চক্রাকারে সারি সারি আবর্ত্ত-রেখা দেখা যাইতেছিল। জল ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থির হইল। কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কল কল শব্দে তরঙ্গ তুলিয়া নির্ম্মলা বহিয়া চলিল। আর কেহই সে বালককে দেখিতে পাইল না।

সম্পূর্ণ।

কুলীন কাহিনী।

"ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতো না পতি থাকিত জীবিত।"

কবিতাবলী।

কুলীন কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি এ বিবাহের বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বাড়ী দেখিয়া কে বলিবে যে এ বিবাহবাড়ী? সে চিরপরিচিত কোন কিছুই লক্ষিত হয় না। সে ঢুলি ভায়া নাচিয়া নাচিয়া মাথা নাড়িয়া 'তাক্‌তাকিসিন' করিয়া বাজাইতেছে না। সে সানাইদার পোঁ পোঁ শব্দে "আয় লো আয় মকর গঙ্গাজল" গান গাহিতেছে না। সে ভিয়ানঘরের কাছে ছেলের পালের লাফালাফি ছুটাছুটি দেখা যায় না। সে হাসির রোল, সে কাজের গোল, কিছুই শোনা যায় না। সে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কিছুই নাই। কদাচিৎ থাকিয়া থাকিয়া যে দুই একবার শঙ্খধ্বনি হইতেছে তাহাও বুঝি অতি চুপে চুপে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, কয়েকটা মেটে প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা লণ্ঠন জ্বলিয়া উঠিল। দুই একজন করিয়া লোকও আসিয়া জমিতে লাগিল। এমন সময়ে 'বর আসিয়াছে' 'বর আসিয়াছে' শব্দ পড়িয়া গেল। এতক্ষণ যাহাই হউক, বর আসিয়াছে শুনিয়া অন্দর মহলে বড় একটা গোল উঠিল। বড় বড় শাঁকে ফুঁ পড়িল। সে শঙ্খরব

অতিক্রম করিয়া উলুধ্বনি ছাপাইয়া উঠিল। তার পর গহনার একটা ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্ ঝমর্ ঝমর্ শব্দ উঠিল। পাড়ার বৌ ঝি বর দেখিতে ছুটিল। ছুঁড়ী বুড়ী কেহই থাকিল না—সকলেই বর আসিয়াছে শুনিয়া দৌড়িল। সারাদিনের মধ্যে যারা একটীবারের জন্যও উঁকি মারে নাই, তারাও লোকমুখে বরের আগমন সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। এ সব কাজে যুবতীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। কেহ ছেলে কাঁকে করিয়া, কেহ মেয়ে মাই দিতে দিতে, কেহ ছোটবোন এখন আসিল না দেখিয়া তাহার উদ্দেশে গালি পাড়িতে পাড়িতে, মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে ছুটিল। মেয়ে ডাকিল—'মা,' মা শুনিল না। বুড়া শাশুড়ী বলিল—'বৌমা,আমি যাব, দাঁড়াও।" বধূ শুনিলেন না। বাহিরে শ্বশুর ভাশুর বসিয়া, বধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া তাহাদের সুমুখ দিয়া চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে আসিয়া বিবাহবাড়ী পৌঁছিল। বর বাহিরে শুনিয়া সকলে বাহিরবাড়ী ধাওয়া করিল। ভিতরে আসিবার অপেক্ষা সহিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিষম হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

বর সম্প্রদানের স্থলে বসিয়া দুই একটা মন্ত্র পাঠের পর ছাঁদ্‌নাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল! বর দেখিয়া সৌদামিনী নাক সিঁটকাইয়া ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল "ওমা এই বর!" গোলাপ বলিল—"তাইত, ভাই, যেন বৃষকাঠ!" নিস্তারিণী বলিল—"এটা যে ঘাটের মড়া!" তাই শুনিয়া নিস্তারের মা তাহাকে চোক টিপিল, পাছে কনের মা শুনিতে পান। নিস্তারিণী চুপ করিল। তখন ক্ষ্যান্ত বলিল "কামিনীর কি পোড়া-কপাল, ভাই, এর আবার ঘর ক'রবে কেমন করে!" সে কথায় বিনোদা বলিল—"হাঁ, নিয়ে ঘর কর্‌লে তো! কুলীনে আবার নিয়ে ঘর করে কোথায় দেখিচিস্।" তখন কুলীনের বিষয় লইয়া দুই একটা কথা উঠিল। দুই এক করিয়া ক্রমে তুমুল আন্দোলনের উপক্রম হইল।

এমন সময়ে কনের মা বরণডালা প্রভৃতি তাহাদের কাছে আনিয়া দিলেন। সুতরাং সমালোচনা রাখিয়া সকলে আপন আপন কার্য্যে মন দিল।

বরটী বাস্তবিক একখানি বৃষকাঠ। বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে; গায়ে মাংস নাই, যাহা আছে তাহা লোল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুলগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দাঁত খুঁজিলে মিলে না, রং যেন কালি ঢালা, হাত পা লম্বা লম্বা, পিঠ কুঁজা হইয়া পড়িয়াছে, বয়োধর্ম্মে কাঁকালটা একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আশৈশব ছিটা টানার অভ্যাসে গলাটী সরু, পেটটী মোটা, তাহার উপর কাঁচা শির বাহির হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাদ। তা, বর যেমনই হউক, মেয়েরা আপন কার্য্য কেহ ভুলিলেন না। বিবাহরাত্রে একখণ্ড অর্দ্ধ-দগ্ধ কাষ্ঠদণ্ডের গায় চেলি জড়াইয়া মাথায় টোপর দিয়া দাঁড় করাইলে তাহাই লইয়া সুন্দরীগণ আমোদের তরঙ্গ তুলিয়া থাকেন। তা, এত জ্যান্ত মনুষ। সুতরাং দেখিতে দেখিতে হাসি টিট্‌কারি, ঠাট্টা তামসার ধুম পড়িয়া গেল। ছোট ছোট ছুঁড়িগুলা গুড়চাল ছড়াইয়া শিলাবৃষ্টি করিয়া তুলিল। বর না চোর এ কথাটি আর কিছুতে না হউক, মারি খাইবার বিষয়ে বটে। চড় চাপড় ঠেলা কাণমলা, কত চোরের সাজা খাইতে হইল। ঠানদিদি মহলে বস্তাপচা রসিকতার গাঁট খুলিতে আরম্ভ করিলেন। আর কিছু হউক বা না হউক, ছাঁদলাতলায় স্ত্রীআচারের কার্য্যটা যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইল। শেষে এক রসিকা ঠানদিদি বলিলেন "এমন পাকা বেল কিনা দাঁড়কাকের হাতে প'ড়লো।" তাই ধরিয়া হাল্‌দারদের সুকুমারী বলিল—

মরি মরি মদনমোহন ভুবন আলো ক'রেছে।
এত সাধের কমলকলি গোবরা উড়ে বসেছে॥

সুকুমারী বড়ই শ্লোকপ্রিয়া। সুকুমারী এ কালের মেয়ে। এ কালের মেয়েরা কেবল নাটক পড়ে, আর কথায় কথায় শ্লোক বলে।

তার পর বিবাহ যথাশাস্ত্র হইল কি? হইল বৈ কি। আর বাসরঘর? তা, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। হায় ধিক্ বাসরঘর! কোন্ বেহায়া এ বাসরঘরের প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল রে? একজন পরপুরুষের সম্মুখে ভদ্রমহিলাদিগের সেই কদর্য্য ব্যবহার—সেই খেমটানাচ—সেই ঝুমুর গাওয়া—সেই শাশুড়ীর শ্যালি সাজিয়া রঙ্গরসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—তাহা দেখিলে লজ্জায় লজ্জাদেবী পলায়ন করেন—এ প্রথা এ বাঙ্গালায় কে আনিয়াছিল রে? যে আনিয়াছিল, হে আকাশ, তাহার মাথার জন্য কি তোমার বজ্র ছিল না?

তার পর, কাক ডাকিল, ভোর হইল। সে দিন জামাই রহিলেন। পরদিবস প্রভাতেই কুশণ্ডিকার আয়োজন হইল। তাহা সমাপনান্তে কুলীন বর আপনার ন্যায্য পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া পুঁটুলি বাঁধিলেন। উঠিয়া ধীরে ধীরে শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন। শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা! আমি অনাথা, আর আমার কেউ নাই, এক একবার মাঝে মাঝে উদ্দেশ নিও।"

"তার আর ভাবনা কি মা, সংবাদ দিলে যেখানে থাকি, আসিব।" জামাই ভাবিলেন, তাইত আমরা চাই, শ্বশুরবাড়ী আসিলেই তো লাভ। যতবার আসিব ততবারই টাকা। অনাথিনী বিধবা এ কথা বুঝিল না। জামাইয়ের জলখাবারের আয়োজন করিল। জামাই জল খাইয়া উঠিলেন।

যেখানকার কনে সেইখানে পড়িয়া রহিল। কুলীনকন্যা বিবাহের পর শ্বশুরঘর করিতে যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কথায় বলে, "মেয়ে মানুষের বাড় যেন কলা গাছের বাড়।" দেখিতে দেখিতে কামিনী বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সে আর ধূলা লইয়া খেলা করে না, পুতুলের বিবাহ দেয় না, ইট কুড়াইয়া খেলাঘর নির্ম্মাণ করে না। কামিনীর বয়স পনর হইয়াছে। সে আর বাহিরে বড় একটা বাহির হয় না, অধিক সময় গৃহের ভিতরেই থাকে। গৃহে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম দেখে, সংসারের কাজে মার সহায়তা করে। মা ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না।

একদিন কামিনীদের সময় বেশ ভাল ছিল। দোতালা চক্ মিলান বাড়ী, ঘর দোর, দাস দাসী তাহাদের অনেক ছিল। কামিনীর পিতা হাটখোলায় কারবার করিতেন। কিন্তু মানুষের এক সময় চিরদিন থাকে না। কারবারে লোকসান পড়িতে আরম্ভ হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধ সমালাইয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি ব্যবসায় তুলিয়া দিলেন। যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, বেচিয়া মহাজনের দেনা শুধিলেন। থাকিল, কেবল একমাত্র বাড়িখানি। অবস্থার তাড়নায় বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। ক্রমে ভাবনায় চিন্তায় রোগে বৃদ্ধের শেষ দশা উপস্থিত হইল। তখন কামিনী পাঁচ বছরের। বৃদ্ধ একদিন স্ত্রীকে ডাকিয়া শয্যার পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "দেখিও সাবধান, আমি চলিলাম। মেয়েটী রহিল। কিছুইতো রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। কিন্তু, দেখিও, খাইতে না পাও, তবু মেয়েটী অঘরে দিও না।" স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে, কাঁদিয়া উঠিল। মাকে কাঁদিতে দেখিয়া কামিনীও যৎপরোনাস্তি

রোদন করিল। বৃদ্ধ বলিলেন, "কাঁদিও না, যাহা বলিলাম মনে রাখিও।" ইহার অল্পদিন পরে তাঁহার কাল হইল। বিধবা একমাত্র কন্যা লইয়া অকূলে ভাসিল।

দেখিতে দেখিতে কামিনী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। ঘটক ঘটকী আনাগোনা করিতে লাগিল। স্বামীর শেষ কথা বিধবার অন্তরে অন্তরে গাঁথা ছিল। তিনি নিকষ কুলীন জামাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ পাত্র সহজে যোটে না। যদি বা যোটে, যে টাকা হাঁকে, তাহা শুনিলে বিধবার প্রাণ উড়িয়া যায়। বাড়ীখানি ভিন্ন তাহার আর কিছুই নাই। কি করে? মেয়ে ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, আর বিবাহ না দিলে চলে না। কত লোকে কত কথা বলে। বিধবা বাড়ীখানি বিক্রয় করিলেন। অনেক কষ্টে এক পাত্র জুটাইয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। পাত্রের অবস্থা শুনিয়া আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকেই এ বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়া ছিল। কিন্তু বিধবা কাহারও কথা শুনিলেন না। পাত্র স্বরূপ কি কুরূপ, ভাল কি মন্দ তাহা কিছুই দেখিলেন না—স্বামীর আদেশ মত ঘর দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহ সেই বাড়ীতেই হইল। কিন্তু বিবাহের পরদিনেই বিধবা তাহা ত্যাগ করিয়া একখানি চালাঘরে কন্যাটী লইয়া আশ্রয় লইলেন।

মেয়ের বিবাহ দিতে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া—সর্ব্বস্বই বা তার কত টাকা?—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা দিয়া বিধবা সেই চালাঘর খানি ক্রয় করিয়াছিল, আর তাহার কিছুই নাই— এখন দিন চলা ভার। বিধবা চরকা কাটিয়া পৈতা তুলিতে আরম্ভ করিল। কামিনীর এখন বয়স হইয়াছে, সে সকল বুঝিল। মাঝে মাঝে পিতার জন্য প্রাণ বড়ই কেমন করিত, কিন্তু মার নিকট কিছুই

বলিত না। মাকে লুকাইয়া সে এক ধারে গিয়া রোদন করিত। তার পর নীরবে চক্ষের জল মুছিয়া চুপ করিয়া মার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া পৈতা তুলিত। দুইজনে পৈতা তুলিয়া তাহা বেচিয়া যাহা হইত, তাহাতেই কোনমতে দিন চালাইত। দুটা পেট, তাহাতে কি হইবে? কোন দিন আধপেটা যুটিত, কোন দিন যুটিত না। কিন্তু এত যে কষ্ট, কামিনী মার কোলে শুইয়া সব ভুলিয়া যাইত। মাও কন্যার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ সামলাইতেন।

দেখিতে দেখিতে কামিনী বাড়িতে লাগিল। অনিন্দ্য কান্তি। সে রূপ দেহে ধরে না। হরিতালে সে রঙের আভা নাই, কাঁচা সোনার বর্ণের সহিত সে বর্ণ মেলে না, দুধে আল্‌তায় গুলিয়া যে বর্ণ ফলে, কদাচিৎ সেই বর্ণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গঠন অতি মনোহর। নাতি খর্ব্ব, নাতি দীর্ঘ, নাতি স্থূল। মাজামাজা, গোলগাল, খাট খাট। সে দেহের প্রতি অবয়ব এক একটী সৌন্দর্য্যের আধার। প্রতি অবয়বের প্রতি ক্রিয়াতেও সেই সৌন্দর্য্য। পদে সৌন্দর্য্য, অঙ্গুলিতে সৌন্দর্য্য, নখে সৌন্দর্য্য,—সে পদবিক্ষেপের পর পদবিক্ষেপেও সেই সৌন্দর্য্য। সৌকুমার্য্যের ইয়ত্তা হয় না। সে মুখ, সে চোক, সে কথা, সে হাসি, সে চাহনি, সকলই সুকুমার। মাথায় চুলের রাশি, বায়ুহিল্লোলে উড়িয়া উড়িয়া ফণিনীর ন্যায় গুচ্ছে গুচ্ছে সেই চুল আসিয়া কপোলে অংশে, বাহুতে পড়িয়াছে। রূপ অতুলনীয়। দুঃখের বিষয় এ রূপের আদর হইল না। এ রূপের আদর কেহ বুঝিল না। কান্তারকুসুমের ন্যায় কান্তারেই ফুটিল, কেহ একটীবারের জন্য সে শোভা দর্শন করিল না। আঁধারে আঁধারে আঁধারে বালিকা বাড়িতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কামিনীদের বাড়ীর কাছে এক ঘর কৈবর্ত্ত ছিল। তাহাদের একটী বৌ ছিল। বড় লক্ষ্মী বৌ,—নাম বিমলা। বিমলার সঙ্গে কামিনীর বড় ভাব। বিমলার স্বামী ছুতার মিস্ত্রির কাজ করিত। কামিনী তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। বৌটীও সেই সম্পর্ক ধরিয়া কামিনীকে ঠাকুর-ঝি বলিত। আরও সেই গ্রামে কামিনীর অনেক সমবয়স্কা ছিল। কিন্তু কামিনী আর কাহারও কাছে যাইত না। আর কেহও তাহার কাছে তেমন আসিত না।

ছেলেবেলা কামিনী যাহাদের সহিত খেলা করিয়াছে, তাহারা এখন বড় হইয়াছে। কেহ ছেলের মা হইয়াছে, কেহ স্বামীগৃহে একমাত্র গৃহিণী হইয়াছে, অনেকেই এখন শ্বশুরবাড়ী। আগে আগে কেহ অনেক দিনের পর শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে শুনিলে, কামিনী তাহাদিগকে দেখিতে যাইত। কিন্তু তাহারা কামিনীর দুঃখে দুঃখ করিত না। কেবল আপনাদের কথা কহিয়াই সময় কাটাইত। তাহাদের স্বামী কেমন, তাহাদিগকে কত ভালবাসে, কত গহনা দিয়াছে, কত আদর করে—সেই সব কথাতেই তাহাদের সময় কুলাইত না, তাহারা অভাগিনীর জন্য দুই দণ্ড দুঃখ করিবে কখন? নিঃশব্দে বালিকা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিত।

গৃহে আসিয়া বালিকা কত ভাবিত, আর দুই চক্ষের জলে মুখখানি ভাসিয়া যাইত। বালিকা ভাবিত, সবাই স্বামীর কথা কয়, সবাই স্বামীর আদরের কথা বলে, আমি কেন বলিতে পাই না? স্বামী কেমন! স্বামীর আদর কেমন! একটী দিনের জন্যও আমি কেন তাহা দেখিলাম না? সবাই দেখে, আমি কেন দেখিতে পাই

না! শুনিয়াছি, স্বামী স্ত্রীর দেবতা, আমি এ বয়সে কি পাপ করিয়াছি যে সে দেবতার পূজা করিতে পাইব না! বালিকা নীরবে, উচ্ছসিতহৃদয়ে নিভৃতে বসিয়া একা ভাবিত, আর দরদরিত ধারায় চক্ষের জল দুই গণ্ড বহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিত।

তাই কামিনী আর কাহারও কাছে যাইত না। সুখ হউক, দুঃখ হউক, বিমলা ভিন্ন আর কাহারও কাছে কোন কথা বলিত না। দিনের মধ্যে একবার বিমলাকে না দেখিলে তাহার মন স্থির হইত না। বিমলা একটিবারের জন্যও কামিনীর সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহিতে না পাইলে, গৃহে তিষ্ঠিতে পারিত না। কামিনীর কোন দিন আহার হইত. কোন দিন আহার হইত না। বিমলা সে সকল কথাই জানিত। সে প্রত্যহই কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিত, কি রান্না হইল। কামিনী যে দিন যাহা হইত বলিত, যে দিন কিছু না হইত, সে দিনও ভাঁড়াইয়া বলিত। কিন্তু বিমলার কাছে সে মিছা কথা খাটিত না। সে কামিনীর মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিত। সে নীচজাতীয়া, নিজে কিছুই খাওয়াইতে পারিত না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শাশুড়ী ননদকে লুকাইয়া কাপড়ে করিয়া চাউল, দাইল, কি তরকারি কামিনীর মাকে দিয়া আসিত। তার পর কামিনী খাইয়া আসিলে, তাহাকে একটী পান সাজিয়া দিয়া, তবে আপনি খাইতে বসিত।

সূর্য্য ডুবিয়া আসিতেছে। অপরাহ্ণ সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ গাছের পাতায় পাতায় ঝিক্ মিক্ করিতেছে। নীচের রোদ পড়িয়া গিয়াছে। ঝিঙের ফুল ফুটিয়াছে। কামিনী ফিতা চিরুণী লইয়া বিমলার নিকট চুল বাঁধিতে আসিয়াছে। কামিনী প্রাণান্তেও চুল বাঁধিতে চাহিত না, এক ঢাল চুল—বড় অসেব্য হইলে জড়াইয়া রাখিত। কিন্তু মাতা তাহা দেখিতে পারিতেন না। অভাগিনার একটী মাত্র মেয়ে সন্ন্যাসিনী

সাজিয়া থাকে, ইহা মার প্রাণে সহিত না, তাই মাতা বলিয়া কহিয়া না হয়, বকিয়া, মেয়েকে বিমলার কাছে চুল বাঁধিতে পাঠাইয়া দিতেন। বিমলাদের মেটে ঘর। তাহার দাওয়ায় মাতুর পাতিয়া বসিয়া বিমলা কামিনীর চুল বাঁধিয়া দিতেছে। এক রাশ চুল—বিমলা সামলাইতে পারিতেছে না। এদিক বাঁধিতে ওদিক খসিয়া পড়ে, আবার সে দিক জড়াইতে এ দিক খসিয়া যায়। সামলাইয়া বাঁধিতে বিমলা এক গা ঘামিয়া ফেলিল। দেখিয়া কামিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"বৌ, তুই যে আমার মাথাটা নিয়ে ভাঁটা খেলাতে বস্‌লি!"

বি। কি করি, বোন্ যে তোর চুল! একি আমার সাধ্যি!

কা। তোর চুল বাঁধবার জন্যে কি তবে দাদা রোজ রোজ দুটা ক'রে মজুর বরাদ্দ ক'রে দেয়।

বি। মজুর কেন দেবে না?

কা। তবে কি দাদা নিজে বেঁধে দেয়?

বি। তুই যেমন নেকি, আজও ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানলিনে, একবার ঠাকুরজামাই এলে সব বুঝ্‌তে পারি।

কামিনী রাগিল। বলিল—"যা, তবে আমি চুল বাঁধব না বল্‌ছি।"

কামিনী রাগিয়া উঠিয়া যায়, বিমলা তাহাকে জোর করিয়া ধরিল। কামিনী বলিল—"আর কেন? হয়েছে তো!"

বি। দাঁড়া একটু সিঁদুর পরিয়ে দিই।

বিমলা কৌটা খুলিয়া চিরুণীর আগায় এক টিপ সিন্দুর লইয়া কামিনীর কপালে পরাইয়া দিতে গেল। কামিনী তাহার হাত ধরিল। বলিল—"আর ও কেন, বোন্?"

বি। ছিঃ ও কথা বলিতে আছে কি? এয়েস্ত্রী মেয়ে, সিঁদুর না পরিলে যে অকল্যাণ হয়।

কামিনীর গলা ভার ভার হইয়া আসিল। বলিল,—"আমার আবার কল্যাণ অকল্যাণ কি বোন্? চুল না বাঁধিলে মা শোনে না, তাই চুল বাঁধি, তার উপর আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কেন, দিদি?"

বিমলা কথা কহিতে পারিল না। অবাক্ হইয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কা। বৌ, ও কৌটার সিঁদুর কৌটায় তুলিয়া রাখিয়া দাও। যে রাবণের চিতা বুকের ভিতর অহর্নিশি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আর সিঁতের উপর সে চিতা জ্বালিয়া কি হইবে, বোন্?"

শুনিতে শুনিতে বিমলার দুটী চক্ষু জলে পুরিয়া আসিল, কামিনীর গলা জড়াইয়া বিমলা কাঁদিতে লাগিল।

বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে কামিনী বলিল—"আমি অভাগিনী, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার জন্যে তুমি কেন কাঁদিবে ভাই?"

বিমলা শুনিল না, তেমনি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন কামিনী তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—"ছিঃ বৌ, কাঁদিও না। আমার আর কেহ নাই, তুমি কাঁদিলে আর কার কাছে যাব!"

অবাক্ হইয়া বিমলা একবার কামিনীর প্রতি চাহিল। ধীরে ধীরে চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিল। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পর দুঃখের কথা বুঝিল। তাই বিমলা কামিনীর মুখচুম্বন করিল।

কামিনী বলিল—'বৌ।'

বি। কেন, ঠাকুরঝি!

কা। সন্ধ্যা হ'লো, চল কাপড় কাচিতে যাই।

বি। চল যাই।

তখন দুইজনে উঠিয়া ধীরে ধীরে কাপড় কাচিতে গমন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ঠাকুরঝি!"

বেলা দুটো কি আড়াইটে, বিমলা আসিয়া কামিনীকে ডাকিল।

কামিনী তখন আহারের পর ঘাটে এঁটো বাসন মাজিতে গিয়াছিল। বিমলার সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিতে আসিতে পথ হইতে জিজ্ঞাসিল—"কে—বৌ?"

বি। হাঁ লো।

কা। এখন কেন লা?

বি। শোন্ বলি। একবার আমাদের বাড়ী আয়।

কামিনী বাসনগুলি ঘরে তুলিয়া মাকে বলিয়া বিমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল।

পথে আসিতে আসিতে অনেক কথা হইল। বিমলাদের বাড়ী পৌছিয়া কমিনী একবার বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বলিল—ও মা, দাদা বাড়ী নেই, তাই বুঝি একা থাকৃতে না পেরে আমায় ডাকৃতে গিয়েছিলি।"

বিমলা ঈষদ্ধাস্যে বলিল—"তাই যদি হবে, তবে তোমায় ডাকৃব কেন? সে দরকার হলে ঠাকুরজামাইকে ডেকে আন্তেম।"

কমিনীও তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল—"তবেই হয়েছে। তা হলেই তোমার দোকা থাকার সাধ মিটেছে।"

বি। কেন, তুমি কি ছেড়ে দেবে না?

কা। পেলে তো! বলে—

আপনি পায় না ঘোল খেতে।
পরকে বলে দুধ নে যেতে॥

বি। আচ্ছা, ঠাকুর-ঝি, সত্য সত্য কি তুমি ঠাকুরজামাইকে দেখ নাই ?

কা। দূর! তা কেন, দেখেছি বৈ কি।

বি। কবে ?

কা। কেন, সেই বিয়ের রাত্রে।

বলিতে বলিতে কামিনীর চক্ষু দুটী জলে পূরিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া বিমলা মনে মনে আপনাকে আপনি গালি দিল। তার পর আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"ঠাকুর ঝি, একটা কথা বলবো, রাখবে ?"

কা। তোমার কথা রাখবো না, এমন কি কথা বৌ ?

বি। দেখ, অনেক দূর থেকে তোমার দাদাকে দিয়া একটা অষুধ আনিয়েছি। সেই জন্যই তোমায় ডেকেছি। অষুধের গুণ বড় চমৎকার—যে দিন ধারণ করবে সেই দিন যেখানেই থাক, স্বামীকে আসতে হবেই হবে। আয়! ঠাকুর-ঝি, অষুধটা পরাইয়া দিই।"

বিমলা ঔষধ পরাইয়া দিতে গেল। কামিনী পরিতে চাহে না, বলিল—"দুর! অষুধ বাঁধিয়া আবার স্বামী-সোহাগী হব কি লা ?"

বিমলা মনে মনে ভাবিল "সত্য, আশ্বিন মাসের দুর্গা প্রতিমার ন্যায় যার রূপ, সেই রূপের উপরে যার এই অসাধারণ গুণ, সে আবার কেন ঔষধ পরিয়া স্বামীসোহাগী হইতে যাইবে? কিন্তু"—বিমলা আবার ভাবিল,—"কিন্তু, সকলি বিধাতার লিপি। বিধাতা কিসে কি করেন কে জানে ?"

বিমলা বলিল—"তা হৌক না, ঠাকুর ঝি, এতো আর গায়ে কামড়াবে না, আয় বাঁধিয়া দিই।"

অগত্যা কামিনী আর কিছু বলিল না। বিমলার আগ্রহ দেখিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। ধীরে ধীরে বিমলা হাতে সেই ঔষধ বাঁধিয়া দিল।

বাঁধিয়া দিতে দিতে বিমলা বলিল—"মা কালী করেন, আজ রাত্রেই ঠাকুরজামাই এসে পড়েন।"

কামিনী একটু হাসিয়া বলিল—"কেন, আজ দাদা ঘরে আসিবে না, বলিয়া গিয়াছে না কি?"

বি। হাঁলো হাঁ, একবার এলে, দেখ্‌তে পাই, কেমন তুই ছেড়ে দিস্।

কা। মাইরি বল্‌চি, বৌ, এলে আগে তোর ঘরে পাঠিয়ে দেব।

বি। তবে বুঝি, তুই আমার ঠাকুরজামাইকে ভাল বাসিস্‌নে। হাঁ ঠাকুর-ঝি, ঠাকুরজামাই না কি বড় কাল?

কুক্ষণে বিমলা এ কথা পাড়িয়াছিল। কামিনী কোন কথা কহিল না। সব সময়ে সব বিষয়ে বুঝিয়া চলা যায় না। বিমলা আবার রসিকতা ধরিল। বলিল—"শুনিছি, তিনি নাকি, দেখ্‌তে বড় কদুয্যি!"

এইবার কামিনী কথা কহিল। বলিল—"ছিঃ, অমন কথা মুখে আনিতে নাই। তিনি সুরূপ হউন, কুরূপ হউন, তিনি আমার স্বামী। আমি তাঁহার দাসী। দাসী হইয়া তাঁহার রূপের বিচার করিবার আমি কে? যে যা বলে বলুক, সেই আমার রূপের শেখর, আমার অন্য রূপে কাজ কি বৌ? আমি একদিনের জন্যও কেন সে রূপ চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পাইলাম না?"

বিমলা অপ্রতিভ হইল। সে অন্তরে অন্তরে বিশেষ শিক্ষা পাইল। মনে মনে বুঝিল, এই বালিকাই সার্থক স্বামীর মর্ম্ম জানিয়াছে। তখন ঊর্দ্ধমুখে, সজল-নয়নে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বিমলা মনে মনে বলিল—"হে হরি, কেন এমন করিলে? তোমার এ কি বিচার ঠাকুর! বিমলা স্বল্পবুদ্ধি, বিমলা স্ত্রীলোক, সে জানিত না যে, এ বিচার ভগবানের নয়; এ বিচার স্বার্থপর ধর্ম্মহীন নৃশংস মানুষের!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈকাল বেলা দাওয়ায় বসিয়া বিধবা চরকা কাটিতেছেন, পার্শ্বে বসিয়া পা ছড়াইয়া কামিনী শলিতা পাকাইতেছে, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দরজায় উঁকি মারিল। "ও মা" বলিয়া জিভ্ কাটিয়া মাথায় কাপড় দিয়া কামিনী দৌড়িয়া ঘরের ভিতর পলাইল। যেথানকার নেকড়া—যেথানকার শলিতা সবই সেইখানে পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধা দ্বারের দিকে চাহিয়া অপ্রতিভ হইয়া আদুড় মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। চরকার ঘেনর ঘেনর শব্দ বন্ধ হইল। তথন বৃদ্ধা উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—"এস, বাবা, এস।"

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। সেই দরজার বাহির হইতেই বৃদ্ধাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"ভাল আছ তো বাবা?"

বলা বাহুল্য এ ব্রহ্মণ বৃদ্ধার জামাতা।

জামাই বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না।

বৃদ্ধা তথন আবার অতি আগ্রহ সহকারে বলিল—"বাহিরে কেন, ভিতরে এস।''

জামাই নড়ে না।

বৃদ্ধা। কতদূর হতে আসচো। আহা মুথথানি শুকৃয়ে গেছে, এস, বাবা, হাত পা ধুয়ে বস্‌বে এস।

জামাই নড়ে না।

বৃদ্ধা। অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা!

এবার জামাই কথা কহিল। বলিল—"মর্য্যাদা—ভিতরে যাইব আমাদের মর্য্যাদা কৈ?"

বৃদ্ধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হতভাগিনী এতক্ষণ ভাবিতেছিল, আহা ঘরে কিছু নাই, কি দিয়া ভাত দিব। বিধাতা এমনি পোড়াকপাল করিয়াছেন যে একদিনের জন্য জামাইটী আসিয়াছেন তাহার পাতে ভাত দিবার শক্তি নাই! তা, কামিনীকে বিমলাদের বাড়ী একবার পাঠিয়ে দেব, বিমলা শুনিলে অবশ্যই কিছু না কিছু ভাল মন্দ সামগ্রী দিয়া যাবে। আবার ভাবিতেছিল, কোথায়ই বা শুইতে দিই? একখানি বৈ ঘর নাই—তাই কি সে ঘরের মধ্যে—না আছে বিছানা মাদুর, না আছে লেপ বালিশ! হা অদৃষ্ট! যার চারিদিকে চকমিলান দোতালা বাড়ী, সে কিনা আজ তার একমাত্র জামাইকে শোয়াইবার জন্য স্থান খুঁজিয়া পায় না। সে কথা ভাবিতেও অভাগিনীর চক্ষে দুই বিন্দু জল দেখা দিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধা আবার ভাবিতেছিল, কতক্ষণে জামাইকে দুটী খাওয়াইব, খাওয়াইয়া বসিয়া দুই দণ্ড নিজের দুঃখের কথা বলিব। বৃদ্ধার নিজের জন্য কিসের দুঃখ! কিন্তু তাহার সেই মেয়েটী—প্রাণের অধিক যতনের ধন সেই মেয়েটী—সে যে অমন করিয়া মুখ শুকাইয়া মুখ শুকাইয়া বেড়ায়, মায়ের প্রাণে তা কেমন করিয়া সহ্য হয়? বৃদ্ধা ভাবিতেছিল, আজ একবার কাঁদিয়া জামাইয়ের কাছে পেটের সকল কথা বলিব। জামাই কি শুনিবেন না, অমন সোণার প্রতিমা মেয়ে—জামাই কি তাহার মুখের দিকে চাহিবেন না! বৃদ্ধা কত কি ভাবিতেছিল—ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে কত আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছিল, জামাইয়ের কথা শুনিয়া তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহসা মুখে কথা আসিল না।

জামাই বলিলেন—"কি বলেন! সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ইহার মধ্যে আমায় আরও দুই এক জায়গায় বেড়াইতে হইবে।"

বৃদ্ধা। সে কি, বাবা, এখন কোথায় যাবে, রাত্রে এখানে থাকিবে না?

জামাই হাসিল। হাসিয়া বলিল—"থাকিব না কেন; কিন্তু আপনি একবার উঠিয়া বসিবার মর্য্যাদা দিতে পারিতেছেন না, রাত্রিবাসের মর্য্যাদা দিতে পারিবেন কি?"

শুনিয়া বৃদ্ধার প্রাণ উড়িয়া গেল। বলিল,—"বাবা, আমি বড় দুঃখিনী।" বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

জামাই বলিল—"কাঁদেন কেন? আপনি দুঃখিনী যদি, তবে দুঃখ দিব না, আমি চলিলাম।"

ভয়ে বৃদ্ধার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুষিক্ত শুষ্ক মুখখানি তুলিয়া বৃদ্ধা বলিল—"রাগ ক'রো না, বাবা। ভগবান্ আমায় বড় মেরেছেন,—আমার কিছু নেই।"

জামাই। কিছু নেই তো, কুলীন জামাই ক'রেছিলে কেন?

বৃদ্ধার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। মনে মনে বলিল—"পৃথিবী, তুমি দোফাক্ হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি।" একবার মেয়ের সেই শুষ্ক মুখ উদাস ভাব মনে পড়িল; দুটী চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া কামিনী এতক্ষণ সব দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সেই আয়ত ইন্দীবরতুল্য পটোলচেরা চোক দুটী জলে ভাসিয়া আসিতেছিল। চক্ষের জলে বালিকা চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল, তাহার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিয়া শব্দ হইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল। বালিকা আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। দুই হাতে মাথা টিপিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

"তবে, তুমি মেয়ে লইয়া থাক, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া জামাই তল্পি-তল্পা গুছাইলেন। যাইবার জন্য পিছন ফিরিলেন।

কপাটের আড়াল দিয়া কামিনী ইহা দেখিল। বৃদ্ধা চক্ষে বস্ত্র দিয়া তখন সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। আর লজ্জা সরম থাকিল না। উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া বালিকা স্বামীর পায় জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের জলে সে দুটী পা ভিজাইল। বিবশ—বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দয়া করিয়া আসিয়াছ তো, একবার উঠিয়া এস, আমি একদিনের জন্যও এ পা দুখানি সেবা করিতে পাই নাই।"

কর্কশ স্বরে ব্রাহ্মণ বলিল,—"এমন কি ভাগ্য করিয়াছ যে আমার ন্যায় কুলীন স্বামীর পদসেবা করিতে পারিবে ?"

কামিনী কাঁদিল। বলিল,—"আমি পোড়াকপালী, কিন্তু তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।"

ব্রাহ্মণ। স্ত্রীর কান্না দেখিয়া চলিলে, আমাদের কুলীনত্ব থাকিত না। তুমি কাঁদিলে আমি কি করিব ? তোমার মা টাকা দেন কৈ !

"আমার মা বড় দুঃখিনী।" কামিনী আর বলিতে পারিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সেই পদতলে মাথা লুটাইয়া অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল। বালিকার সে অবস্থা দেখিলে পাষাণও ভেজে, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের হৃদয় ভিজিল না। বলিল—"পা ছাড়িয়া দাও, আমি যাই।"

ব্রাহ্মণ পা ছাড়াইয়া লইতে গেল। কামিনী তাহা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"একবার—একবার দাঁড়াও,আমি দেখি,কিছু পাই কি না।"

বালিকা তখন জ্ঞান হারাইয়াছিল। তাহার গায়ে যেন বিষের জ্বালা জ্বলিতেছিল। প্রাণের ভিতরে যে সহস্র ক্ষত কে যেন তাহার

মুখে মুখে লঙ্কা বাটিয়া দিয়াছিল। উন্মাদিনীর ন্যায় বালিকা ছুটিয়া বিমলাদের বাড়ি গেল। ছুটিয়া গিয়া তাহার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। টিপিয়া টিপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া সকল কথা বলিতে বলিতে সেই বালিকা বড় কান্না কাঁদিল। তখন বিমলাও কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া ঘরের ভিতর গেল। তার পর বাহিরে আসিয়া কামিনীর হাতে পাঁচটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"যা, ঠাকুর-ঝি, আর দাঁড়াস্‌নে, দেরি হইলে চলিয়া যাবে।"

বালিকা কিছু বলিতে পারিল না। একবার সাশ্রুলোচনে বিহ্বল-দৃষ্টিতে বিমলার প্রতি চাহিল। দর দর করিয়া দুই চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া বিমলার কোমল হৃদয়খানি গলিয়া গেল। কামিনীর মুখখানি আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল—"এই বেলা যাও। ও টাকা আমার বাপের বাড়ীর।"

কামিনী আসিয়া মার হাতে টাকা কয়টী দিল। মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধা স্বর্গ দেখিল। তখন ধীরে ধীরে সেই টাকা কয়টী জামাইয়ের হাতে দিল। তখনও জামাই সেই দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া।

জামাই বলিল—"ইহাতেই বলিতেছিলে, মা, এক রাত্রি থাকিতে। আমরা কানাই ছোটঠাকুরের সন্তান। দশ টাকার কম আমরা কোনও শ্বশুরবাড়ী পা ধুই না।" এই বলিয়া হাতের সেই পাঁচ টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"বাবা!"

জামাই শুনিল না। বলিল—"অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, এ কথা আগে বলিলেই হইত। আমি চলিলাম।"

জামাই চলিয়া গেলেন। কপালে করাঘাত করিয়া অভাগিনী কাঁদিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া, বিমলা তাড়াতাড়ি করিয়া কামিনীদের বাড়ী গমন করিল। প্রথম সম্ভাষণে ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে কিরূপ আলাপ করিবে তাহা মনে মনে ভাবিল। তাহার পর ঠাকুরঝিকে ঠাকুর জামাইয়ের পাশে বসাইয়া কি তামাসা করিবে তাহাও ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে হাসিতে হাসিতে বিমলা আসিয়া কামিনীর মাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া বলিল—"কৈ গো, তোমার জামাইকে কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌লে গো!"

বৃদ্ধা তখনও দরজায় বসিয়াছিল, তখনও চক্ষের জলে বুক ভাসিতেছিল। সন্ধ্যার আঁধারে বিমলা তাহা টের পায় নাই।

কামিনীর মা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"মা, এমন কপাল কি করেছি যে আমার আবার সে দিন হবে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা সকল কথা বলিল। শুনিয়া বিমলা কাঁদিল। তার অন্তরে বড়ই আঘাত লাগিল। তখন, যেখানে দরজার পাশে অধোমুখে বসিয়া সাক্ষাৎ নিরাশার উদাসমূর্ত্তি সেই বালিকা নীরবে কাঁদিয়া চক্ষের জলে মাটী ভিজাইতেছিল, বিমলা সেইখানে গিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। কামিনী তাহার গলা জড়াইয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অজস্র ধারে কাঁদিতে লাগিল। বিমলাও কাঁদিল। দুই জনের কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। কথা তখন মুখে আসে না। দুই জনে গলা ধরাধরি করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে কামিনী বলিল—'বৌ।'

বিমলা। ঠাকুর-ঝি।

কা। সব তো হ'লো, আর কেন বৌ?

বি। বালাই, ও কথা মুখে আনিতে নাই। বুড়ীর আর কে আছে, ঠাকুর-ঝি?

কামিনী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। চক্ষু মুছিয়া বলিল—"মা কোথায়?"

বি। সেই দরজার পাশে বসিয়া কাঁদিতেছেন।

কা। চল, যাই দেখি।

কামিনী উঠিল। বিমলা বাড়ী গেল। তার পর রাত্রি হইল। সে রাত্রি পোহাইল, দিন আসিল, আবার সে দিনও গেল। এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিল। সকল সময় এক রকমে কাটে না। সকল সময় সব সয় না। ভাবনায় চিন্তায় মনের কষ্টে—কামিনীর মা জ্বরে পড়িল। জ্বর অল্প হইল, বৃদ্ধা সে জ্বরকে জ্বর জ্ঞান করিল না। তাহারই উপর স্নান আহার ঘোল অম্বল সব চলিল। কেহ মানা করিলে বিধবা শুনিত না, বলিত, 'আহা, মা, আমার আবার সে দিন কি হবে, কামিনীকে রাখিয়া কামিনীর মা হইয়া মরিব?' বৃদ্ধা সুবিধা পাইলে সব অত্যাচার করিত। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। বৃদ্ধা শয্যাগতা হইয়া পড়িল। আহারের সঙ্গতি নাই—চিকিৎসা হইবে কোথা হইতে? তায় বিধবা ঔষধ খাইতে চাহিত না। কামিনী তাহার বিছানায় বসিয়া কাঁদিত। বৃদ্ধা বলিত—"ভয় কি মা, আমার কি মরণ আছে, আবার সারিয়া উঠিব।" কামিনী কাঁদিত। আর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মাতার সেবা করিত। মাঝে মাঝে বিমলা আসিয়া দেখিত। জ্বর বাড়িয়া উঠিল—বিকার ধরিল। শেষ অভাগী সকল জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইল।

কামিনী একা। এই জনকোলাহলপূর্ণ বিশাল সংসার মধ্যে কামিনী একা। এ পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য নর নারী, প্রতিনিয়তঃ

কতশত ঘটনা ঘটিতেছে, কত কার্য্যের তুমুল তরঙ্গ উঠিতেছে, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই মানুষের পর মানুষ, কোলাহলের পর কোলাহল, —এ পৃথিবীর মধ্যে এ বালিকা কেহই নহে।" অনন্ত সমুদ্রসৈকতে এক বিন্দু বালুকণার ন্যায় একধারে একলা পড়িয়া। কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, কেহ মুখের দিকে চাহে না, দারুণ দুঃখে আহা বলিয়া কেহ দুটা সান্ত্বনার কথা বলে না। কেহ নাই—কার কাছে যায়—বালিকা সংসারের মধ্যে একটী আপনার জন খুঁজিয়া পায় না। এক বিমলা—দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী বিমলা—বিমলা না থাকিলে বালিকার এতদিন কি হইত, তাই বালিকা ভাবে। এ সংসার বালিকার নিকট অরণ্য মাত্র।

কাঁদিতে কাঁদিতে একদিন কামিনী ভাবিল,—মরি না কেন? যা হবার সব তো হ'ল, আর বাঁচিয়া কি সুখ, এইবার মরি না কেন? এ পোড়া প্রাণ আর কিসের জন্য? এ ছার দেহভার বহিয়া কি হইবে? যাহার জন্য দেহ সে তো একবার ফিরিয়া চাহিল না, তবে এই বেলা গঙ্গার জলে এ দেহ বিসর্জ্জন করি না কেন?" ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষের জলে বুক ভাসিতে লাগিল। আবার কামিনী ভাবিল—"যদি মরিতেই হইল, তো শুধু শুধু মরিব কেন? এত দিন যাঁহার জন্য এ দেহ রাখিলাম, তাঁহাকে আর একবার না দেখিয়া এ দেহ কেন পরিত্যাগ করিব? একবার দেখিব। আমি অভাগী কখন চক্ষু ভরিয়া সাধ মিটাইয়া দেখিতে পাই নাই—এ প্রাণের সেই প্রাণসর্ব্বস্বকে না দেখিয়া এ প্রাণ কেন বাহির করিব? সেই পবিত্র পাদপদ্ম ভিন্ন এ প্রাণ পরিত্যাগের তেমন স্থান আর আছে কি?" কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু মুছিয়া বালিকা উঠিয়া বসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দশটা বাজিয়াছে। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কুলীন ঠাকুর পৈতার গ্রন্থি দিতেছেন। দূরে বহুদিনের ভৃত্য রাম সেবক কলিকায় তামাকু সাজিয়া বাম হস্তে কলিকা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে আগুনের মাল্‌সা হইতে আগুন তুলিতেছে। বহির্দরজায় আসিয়া ডাক হরকরা হাঁকিল—"কে আছ গো, একখান পত্র আছে।"

কলিকায় আগুন তুলিয়া ফুঁ দিতে দিতে রামসেবক জিজ্ঞাসা করিল "কিসের পত্র গা, দাদাঠাকুর—নেমন্তন্নের পত্র না কি?"

কুলীন ঠাকুর বলিলেন—"আমি কেমন করে বল্‌বো, তুইও যেখানে আমিও সেখানে, বেরিয়ে দ্যাখনা কি পত্র।"

তাড়াতাড়ি কলিকায় দুই দম্ মারিয়া "দাদাঠাকুর, খাও" বলিয়া কলিকা রাখিয়া রামসেবক বাহিরে গেল। হরকরা তাহার হাতে পত্র দিল। রামসেবক পড়িতে জানিত না, উলটিয়া পালটিয়া পত্রখানি দেখিল। দেখিল, তাহা লাল কাগজে লেখা। দেখিয়া সে কি বুঝিল। সে এ রকম পত্র মাঝে মাঝে প্রায়ই আসিতে দেখিত। এ সম্বন্ধে তাহার একটা জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধই জন্মিয়াছিল। পত্রখানি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রামসেবক আসিয়া তাহা দাদাঠাকুরের হাতে দিল।

ব্রাহ্মণ পৈতার গ্রন্থি রাখিয়া, সুতা মাথায় জড়াইয়া, পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

নমস্কারা নিবেদন—

অনেক দিবস আপনার সংবাদ না পাইয়া বড় ভাবিত আছি, একবার দর্শন দিলে চরিতার্থ হইব। সম্প্রতি আমার ভগ্নী শ্রীমতী মধুমতীর পুত্রটী আট মাসে পড়িয়াছে। আগামী রবিবার তাহার শুভ অন্নপ্রাশন দিব

মনে করিয়াছি। আপনি তাহার পিতা, আপনি নহিলে কে নান্দীমুখ করিবে?—অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আগামী পরশ্ব এ বাটীতে অবশ্য অবশ্য আসিবেন। আমরা আপনার পায়ের ধুলার প্রত্যাশায় রহিলাম। কিমধিকমিতি।

শ্রী—(সাং দুর্গাপুর)

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"রামসেবক, যাহা ভাবিতেছিলে, তাহাই।"

রাম। কি, দাদাঠাকুর, নেমন্তন্ন না কি?

ব্রা। আর দেখ কি, তল্পি বাঁধ।

রাম। আজই?

ব্রা। আজই। কিন্তু—

রাম। আবার কিন্তু কি দাদাঠাকুর!

ব্রা। কিন্তু, দুর্গাপুর হইতে পত্র আসিয়াছে—দুর্গাপুরে আমি বিয়ে কর্লে'ম কবে?

রাম। মনে ক'রে দেখ না।

ব্রা। মনে তো পড়ে না।—একবার খাতাখানা নিয়ে আয় দেখি।

গণনা করিয়া দেখিলে, ব্রাহ্মণের বিবাহ সংখ্যা প্রায় এক শত পার হয়। ক্ষুদ্র স্মরণশক্তিতে সব বিয়ের কথা মনে থাকিত না; তাই ব্রাহ্মণের কোথায় কবে বিবাহ হইল, তাহার একটা তালিকা থাকিত। সেই তালিকা দেখিয়া প্রয়োজনমত শ্বশুরালয়ে গমন করিতেন। কোথায় কোন্ বিবাহ হইয়াছে তাহা স্মরণ না হইলে সেই তালিকা দেখিয়া স্মরণ করিতেন। রামসেবক সেই তালিকার খাতাখানি আনিয়া দিল।

ব্রাহ্মণ এক এক করিয়া সেই তালিকা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুর্গাপুরের ঠিকানা মিলিল। ঠিকানার সহিত নামটাও মিলিয়া গেল। আর ভাবনার বিষয় কি? ব্রাহ্মণ বলিলেন "রামসেবক, হইয়াছে। খাতায় দুর্গাপুর পাওয়া গিয়াছে। আজ ছয় বৎসর হইল, এখানে বিবাহ করি। তারপর, সেই বিবাহ রাত্রির পর এ পর্য্যন্ত আর সেদিকে যাওয়া হয় নাই। তাই, নামটা মনে পড়িয়াও পড়িতেছিল না।"

শুনিয়া রামসেবক বলিল—"দাদাঠাকুর! একটা কথা ব'র্ল্বো?"

ব্রা। কি, রামসেবক?

রাম। বলি, আপনিই ব'লছেন বিয়ে করেছেন আজ ছ' বছর, বিয়ে করেও আর একবারের জন্য সে মুখো হন নাই, তবে যে আজ সেজে-গুজে ছেলের ভাত দিতে যাবেন, এ কেমন কথা হ'লো, দাদাঠাকুর!"

ব্রাহ্মণ একটু হাসিলেন। বলিলেন, "এই—এই কথা!"

রাম। তা—তা আপনাদের কুলীনের ঘরে—

ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠিল। বলিল—"হাঁ, রামসেবক, আমাদের কুলীনের ঘরে এ সব বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়। আমি তো অন্নপ্রাশনের সময় আমার পুত্রের সম্বাদ পাইয়াছি। আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, আমার জন্ম সম্বাদ তিনি আমার পৈতার সময় পাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া রামসেবক অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—"দাদাঠাকুর, আমরা চাষাভূষো লোক, কুলটুলের ধারও আমরা ধারি না। কিন্তু বাদলার মা একদিন দুপুরবেলা এক্লা পরাণ মল্লিকের বাড়ি দুধ দিতে গিয়েছিল তাই দেখে আমি তার মুখে তিন লাথি মেরেছিলেম, আহা! সেও সেই দুঃখে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল।"

রামসেবকের ছেলের নাম বাদল। সে বড় বাদ্‌লা বৃষ্টির দিন হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "রামসেবক, তোমরা আর আমরা—কথা ঢের স্বতন্ত্র।"

রাম। তা হবে। ঐ যে বলে "দেবতার বেলা লীলে খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা"—তা বড় মিছে নয়।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—"তাও আর বলিতে। কথায়ই আছে, বামন শূদ্র তফাৎ!"

রাম। তবে, নাকি, দাদাঠাকুর, তোমাদের বামনদের সমাজের আরও আঁটাআঁটি?

ব্রা। তা না তো কি? কিন্তু আমরা আর কি যে সে মড়িপোড়া বামন! কার সাধ্য আমাদের উপর একটা কথা কয়? সমাজ কাদের নিয়া? আমরাই তো সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা। আমরা যার জাতি রাখি, তারির জাতি থাকে; যার জাতি না রাখি, তার জাতি অধঃপাতে যায়। আমরা কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তান আমরা যেখানে পা ধুই, অনেক বামুনে সেখানে মাথা পাতিতে পারে না। বামন হ'লেই হ'লো না, রামসেবক। দেখনি কি, দলাদলি বাঁধিলে আমরাই তার মীমাংসাকর্ত্তা, সভায় মালা-চন্দনের ভাগ আগে আমাদের পাওনা, পঙ্‌ক্তিভোজনে আমাদের টালিয়া কার সাধ্য অন্যের পাতে মাছের মুড়া দেয়? তুমি অত কথা বুঝিবে না, রামসেবক, বল্লাল না বুঝিয়া কি আমাদের এতবড় মান দিয়া গিয়াছেন!"

বাস্তবিক, রামসেবক অত কথা মোটা বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু কথাটা তার ভাল লাগিল না। সে মনে মনে বলিল—"তোমার বল্লালের বাপ নির্ব্বংশ যাক্।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালিন্দী বড় প্রকাণ্ড দীঘি। উঁচু উঁচু পাড়, সেই পাড়ের উপর বড় বড় গাছ। চারি ধারে চারিটী সানবাঁধান ঘাট—ঘাটের পাশে পাশে শিবমন্দির। সেই শিবমন্দিরের সম্মুখেই নানাবিধ ফুলগাছ - প্রথম ছোট ছোট—যূঁই, মল্লিকা, গন্ধরাজ, গোলাপ; তার পর বড় বড়—চাঁপা, বক, বকুল, অশোক। ডালে ডালে অসংখ্য পাতা, পাতায় পাতায় ঘন ছায়া। দুই প্রহরের সময়েও ঘাটে বড় রোদ পড়িতে পারিত না। সেই ছায়াতলে রৌদ্রতাপিত অনেক লোক শুইয়া বা বসিয়া থাকিত। কালিন্দীর কাল জল। সেই জলে অনেক মাছ খেলা করিয়া বেড়াইত; অনেকে সখ করিয়া খৈ মুড়ি ফেলিয়া মাছের খেলা দেখিত।

তখনও সূর্য্য ডুবিয়া আসে নাই, তখনও একেবারে রোদ পড়ে নাই, বাবুবেশধারী কতকগুলি যুবক ঘাটের রাণায় বসিয়া মুড়ি ছড়াইয়া মাছের খেলা দেখিতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া দল বাঁধিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মাছগুলি ভাসিতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া মুড়ি মুখে করিয়া দলে দলে ডুবিতেছিল, কোনটা দূরে একলা একপাশে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কোনটা বা একটু ভাসিয়া লেজ নাড়িয়া জল ছিটাইয়া ডুবিতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুবকেরা মাছের খেলা দেখিলেন। রোদ পড়িয়া আসিল। তাঁহারা উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিবামাত্র একজন থমকিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গীদের বলিলেন—"দেখ দেখ।" সকলে এক সঙ্গে চাহিয়া দেখিল। পা নড়ে না। দেখিল, চাঁপা গাছের ছায়ায় শুইয়া এক মোহিনীমূর্ত্তি। উপরে গাছের প্রতি শাখায় অসংখ্য ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; কিন্তু নীচে যে কুসুমময়ী মূর্ত্তি শুইয়া, তাহার কান্তির কাছে সে ফুলের বর্ণ কিসের? তবু সে দেহ আতপতাপে—ততোধিক মনের

তাপে শুকাইয়া গিয়াছে। বালিকা ছায়া দেখিয়া শুইয়াছিল, তার পর ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সেই মাটীর উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাটীর উপর শুইয়াই সেই দেহের কত রূপ! নিদ্রাকালীন সে সুন্দর মুখখানি যেন আরও কত শ্রী ধারণ করিয়াছে। নিবিড় কুঞ্চিত কেশদাম বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, ঈষৎ প্রোদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠের মধ্যে দিয়া তুষারধবল দন্তগুলি যেন মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে রূপ দেখিলে কি নয়ন ফিরে? কিন্তু সকলের দৃষ্টি সমান নহে। কারও দৃষ্টিতে সুধা ঝরে, কারও দৃষ্টিতে গরল উগারে। লালসাময়ী গরল দৃষ্টিতে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহারা সেই নিসর্গসুন্দর রূপ দেখিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে তাহারা পরস্পরে যে সব ভাষায় কথা কহিতে লাগিল তাহা, হে কলুষিতদৃষ্টি ভদ্রকুলতিলক বাবুগণ, আমায় মাপ করিও, আমি লিখিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে তোমাদের ভাষা, তোমাদেরই থাক্, এ ক্ষুদ্র লেখকাধম তাহা লিখিতে অক্ষম।

একজন বলিল—"জাগাব?"

সে কথার উত্তরে আর একজন কি বলিল। কথাটা বড়ই রসের বটে। তাহা শুনিবামাত্র সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘুমন্ত বালিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ভয়ে বালিকা আড়ষ্ট হইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতর গুরগুর করিতে লাগিল। ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় বালিকা আকুল হইয়া পড়িল।

অতি কদর্য্য সম্বোধন করিয়া একজন তাহার হাত ধরিতে গেল। বালিকা লাফাইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার কান্না আসিল। সজলনয়নে যুক্তকরে তাহাদের প্রতি চাহিয়া বলিল—"দোহাই তোমাদের—তোমরা আমার ধর্ম্মের বাপ।"

শুনিয়াছি, বাপ বলিলে ভূতে ধরে না; কিন্তু একে জ্যান্ত তায় ভদ্র ভূতের দল সে কথায় কিছু মাত্র টলিল না। যে নরাধম হাত ধরিতে গিয়াছিল সে আবার একটা কুৎসিৎ কথা উচ্চারণ করিল। তাহা শুনিয়া আর আর সকলে উচ্চহাস্য করিল।

ভয়ে বালিকার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। দেহের এক সের রক্ত কে যেন শুষিয়া লইল। সেইক্ষণে তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। একবার উর্দ্ধমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হে হরি, দয়াময়, দয়া করিয়া দাসীকে এ বিপদে রক্ষা কর।"

তখন সকলে মিলিয়া চারিদিকে বেড়িয়া বালিকাকে ধরিতে গেল। এমন সময়ে কলসী কাঁকে সারি সারি কতকগুলি স্ত্রীলোক জল লইতে সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগ্নোদ্যম হইয়া, ব্যথিত-হৃদয়ে যে যেখান দিয়া পারিল, লাফাইয়া যুবকেরা পলাইয়া গেল।

রমণীরা সেই ঘাটের উপর আসিলেন। তখনও বালিকা সেইভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়া একটী ছোট মেয়ে বলিল—'বামন দিদি, দেখ, গাছতলার দিকে চেয়ে দেখ।'

বামন দিদি বলিলেন—'দেখলি নে ছোঁড়া গুলো সব পালিয়ে গেল। মরণ আর কি, কালামুখা ধিক্‌জীবনীদের দিন দুপুরেও লজ্জা সরম নেই।'

'না দিদি, ও বুঝি তেমন লোক নয়। আহা দেখ, কাঁদ্‌চে।'

"তুই চল্, ওসব কান্না ঢের জানি।—এখনও হ'য়েছে কি—বলে—

"আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে,
পশ্চাৎ কাঁদিতে হবে অজ্‌ঝোরঝরে।"

অন্য একজন বলিল—'কিন্তু, রূপ দেখেছো?'

'অমন রূপের গলায় দড়ি!'

আর একজন বলিল—'যেন ভাল মানুষ ব'লে বোধ হচ্চে, ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো ?'

এইবার বামনদিদি রাগিয়া উঠিলেন। তর্জ্জন করিয়া বলিলেন "চল্‌, দেখি, ছুঁড়িরে বাড়ি! আ মর! ভদ্রলোকের ঘরে গৃহস্থের মেয়ের ওসব লোকের সঙ্গে কথা কহা কি র‍্যা ?"

বামনদিদির রাগ দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না। জল লইয়া ধীরে ধীরে সকলে চলিয়া গেল।

নীরবে মাটীপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালিকা সব শুনিল। যত পারিল, অজস্রধারে কাঁদিল। তার পর যখন দেখিল, আর কেহ কোথাও নাই, মনে মনে ভাবিল, "এই তো বেশ সময়—দীঘির অগাধ জল—এই জলে ডুবি না কেন ? আরও বাঁচিলে না জানি কপালে আরও কি ঘটিবে, এই বেলা মরি না কেন ?" আবার ভাবিল—"একদিন যাহা ভাবিয়া মরি নাই, আজই বা মরি কেন ? মরিবার হইলে, সেই দিন মরিলেই তো সব চুকিয়া যাইত। কিন্তু সেদিন সে দুঃখেও যখন মরি নাই, তখন আজ কেন মরিব ? যে মুখখানি দেখিবার জন্য পথে পথে বেড়াইতেছি, সে মুখখানি না দেখিলে এ প্রাণ কেমন করিয়া বাহির হইবে ? কিন্তু আর কি তা হবে ?"—বালিকা আর ভাবিতে পারিল না। চক্ষের জলে বুক ভাসিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার স্তরে স্তরে নামিতে লাগিল। বালিকার আরও যেন ভয় বাড়িল।—"এ রাত্রে কোথায় যাইব ? এ সংসার মধ্যে অভাগিনীর স্থান কোথায় আছে ? যেখানেই যাই, সেখানেই ঐ রূপ—রূপ—রূপ। ছাই রূপ! হে বিধাত! দুঃখিনী করিলে তো অভাগিনীকে যৎকুৎসিতা করিলে না কেন ?" বালিকা আবার কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কিশোরীমোহন বাবু কায়স্থ কি কি জাতি কেহ তাহা বলিয়া উঠিতে পারে না। তিনি তাঁহার নামের শেষে লেখেন—দাস। সেই "দাস" শব্দটী দেখিয়া অনেকে অনেক কথা আঁচাআঁচি করে, কিন্তু ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে পারে না। কিশোরীমোহন বাবু বড়লোক—মুন্সেফ—শীঘ্রই সদরালা হইবার সম্ভাবনা—তিনি যে জাতি হউন সকলেই তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী, সুতরাং কে কি বলিবে? অনেক স্মার্ত্তবাগীশ লুকাইয়া তাঁহার বাড়ি জলপান করিয়া থাকেন! তাঁহার দক্ষিণার বন্দোবস্তটা বড়ই পরিপাটী।

ইংরাজপছন্দ চৌবারাণ্ডা বাড়ী। সন্ধ্যার পর তাহার গাড়িবারাণ্ডার ছাদে বসিয়া বাড়ীর অনেকগুলি স্ত্রীলোক। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের শমতা জন্য বাতাস সেবন করিতেছে। সকলের মধ্যে বসিয়া বর্ষীয়সী প্রাচানা কিশোরীবাবুর মাতা। বুড়ী পা ছড়াইয়া গা খুলিয়া বসিয়া আছে, আর পিঠের উপর পড়িয়া পাঁচ বৎসরের নাতিনী মাথার বেতো চুল টানিয়া দিতেছে। মাঝে মাঝে নানা গল্প, ও হাস্যপরিহাস চলিতেছে। পিছন হইতে কে ডাকিল—"গিন্নি মা ওখানে আছ গা?"

বুড়ী বলিলেন—'কে—চাঁপা?'

চাঁপা বাড়ীর দাসী।

চাঁপা বলিল—"একজন বাম্‌নের মেয়ে রাঁধুনি রাখ্‌বেন বলেছিলেন যে, রাখ্‌বেন কি?'

গিন্নী। কৈ, তা পাই কৈ? তোর সন্ধানে আছে?

চাঁপা। এই, মা, এই মেয়েটী থাক্‌তে চাহিতেছেন। আহা৹ দিব্বি মেয়ে।

গিন্নী চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন—"তাইত! আহা দিব্বি মেয়েই বটে। তা, বসো, মা, বসো।"

হেঁটমুখে নীরবে একটী সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা দাঁড়াইয়াছিল। বালিকা জড়সড় হইয়া একধারে বসিল।

বালিকাকে দেখিয়া গিন্নীর দয়া হইল। বলিলেন—"তা, তুমি সব কাজ কর্ম্ম কি পারবে গা?"

বালিকা নম্রস্বরে উত্তর করিল—"পার্‌বো।"

দেখিতে দেখিতে বাড়ীর যে যেখানে ছিল সেইখানে আসিয়া যুটিল। তাহাদের মধ্যে যাঁহার রূপবতী বলিয়া একটু গৌরব আছে, তিনি বালিকাকে দেখিয়া মুখ সিটকাইয়া উঠিলেন। সকলেই আসিয়া এক-বাক্যে বলিল—"তাইত গা, এমন রূপ তো দেখিনি।"

রূপের কথা শুনিয়া বালিকার প্রাণে ভয় হইল। আবার পোড়া রূপ!

তখন একেবারে চারিদিক্ হইতে সকলে নানা প্রশ্ন আরম্ভ করিল। কেহ বলিল—"তোমরা কি বামন গা?" কেহ বলিল—"তোমার বাড়ী কোথায় গা?" কেহ বলিল—"তোমার আর কে আছে গা?" যে বালিকার অতি নিকটে ছিল, সে বলিল—"হাঁ গা, তোমার দেখ্‌ছি পরণে শাড়ী, হাতে নোয়া—তুমি কি এয়েস্ত্রী?"

বালিকা এ সকল কথার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। কাতর মুখখানি তুলিয়া একবার বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিল। অমনি দুটী চক্ষের জল গড়াইয়া মুখখানি ভাসিয়া গেল। দেখিয়া বৃদ্ধার দয়া হইল। সকলকে বলিলেন—"তোরা এখন যা বাছা, এর পর ঢের সময় আছে, তখন পরিচয় নিস্।"

কেহ বুঝিল, কেহ বুঝিল না; সকলে যে যার কাজে চলিয়া গেল। বালিকা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

* * * *

এক বৎসর কাটিয়া গেল, বালিকা পাচিকা হইয়া সেই বাড়ীতে রহিল। বাড়ীর সবাই বালিকার রূপে মুগ্ধ, গুণে আবার ততোধিক বশীভূত। প্রথম প্রথম আর দুই একদিন কেহ কেহ তাহার পরিচয়ের কথা পাড়িয়াছিল; কিন্তু বালিকা কিছুই বলে না। কিছুই বলে না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, আর দুটী চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। তাহা দেখিয়া, আর কেহ কখন সে কথা তুলিত না। কিন্তু সকলে দেখিত, বালিকা আয়ত রাখে, সিঁদূর পরে, মাছ খায়, দুবেলা ভাতে বসে। দেখিয়া সকলে বুঝিত, বালিকা সধবা। কিন্তু কেহ কিছু আর বলিত না।

সকলেই বালিকাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। সকলের অপেক্ষা গৃহিণী আবার অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার জন্য বালিকাকে বড় একটা বেশী খাটুনি খাটিতে হইত না। যেদিন বালিকার ভাবনায় চিন্তায় বড় দুঃখ হইত, সে দিন যদি না খাইত, গিন্নিও খাইতেন না। বলিতেন—“সে কি মা, তুমি বামুনের মেয়ে আমার বাড়ী উপোস্ ক'রে থাক্‌বে, আমি কেমন ক'রে মুখে ভাত তুলবো?” কাজেই বালিকা আবার ভাতে গিয়া বসিত। কিন্তু সে কেবল এঁটোমুখ করা মাত্র। গিন্নি তাহা বুঝিতেন, আবার স্বতন্ত্র জলখাবার আনিয়া দিতেন। মাসে মাসে গিন্নি তাহার মাহিয়ানা দিতে আসিতেন, বালিকা তাহা লইত না। বলিত,—“এখন আপনি রাখিয়া দিন, আমার যখন আবশ্যক হইবে, একেবারে দিবেন।” বৃদ্ধা টাকাগুলি যতনে তুলিয়া রাখিয়া দিতেন।

একদিন সকালবেলা বালিকা শুনিল, আজ গৃহিণীর মেয়ে আসিবেন। চাকর দাসী সকলেরই মুখে সে মেয়ের সুখ্যাতি ধরে না। সবাই বলে, অমন গুণের মেয়ে আর হবে না। কি মিষ্ট কথা, কি দয়ামায়া, কি যত্ন-আয়িত্যি—যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! শুনিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্য বালিকার বড়ই কৌতূহল হইল।

অপরাহ্ণে বাড়ীর বাহিরে একখানি পাল্কী আসিয়া লাগিল। যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া বাহিরে গেল। বালিকা বুঝিল, গিন্নির মেয়ে আসিয়াছেন। সে দেখিবার জন্য মাঝ দরজার পথটীতে একলা দোর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাল্কী হইতে উঠিয়া, মেয়ে মাকে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে সকলের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাঝ দরজায় সেই বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল, চোখে চোখে দুইজনের চারি চক্ষু মিলিল। বালিকার দৃষ্টিলোপ হইল, মাথা ঘুরিয়া আসিল, অজ্ঞান হইয়া সেইখানে পড়িয়া গেল।

"কি হইল! কি হইল!" বলিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি দৌড়িয়া বালিকার মাথা আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। কতক্ষণ পরে বালিকার একটু সংজ্ঞা হইল। একবার চক্ষু মেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "বৌ"! ফুকারিয়া বিমলা কাঁদিয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—'ঠাকুর ঝি!' বালিকা কথা কহিল না, বিমলার কোলের ভিতর মাথা লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, গিন্নির মেয়ে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা বিমলা। আর এই বালিকা সেই অভাগিনী কামিনী।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিমলা যখন আসিল, তখন কথা আর ছাপা থাকিল না। বিমলার মুখে সকলেই কামিনীর পরিচয় পাইল। শুনিয়া তাহার জন্য সকলের দুঃখ ও সহানুভূতি আরও বাড়িল। কিন্তু কামিনী সেই যে কি ক্ষণে পড়িল, আর উঠিল না। দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল, কামিনী শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। কি যে রোগ কেহই কিছু ঠিক করিতে পারে না। কেবল ভয়ানক অন্তর্দ্দাহ, আর পিপাসা। বালিকা কেবল থাকিয়া থাকিয়া বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করে, আর 'বুক গেল! বুক গেল!' বলিয়া চীৎকার ছাড়িয়া উঠে। গৃহিণী ছেলেকে বলিয়া ভাল ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। বলিলেন— "রোগ কঠিন—বহুদিনব্যাপী দারুণ মানসিক চিন্তা ও কষ্টে এই হৃদ্‌রোগ জন্মিয়াছে, এ রোগ ভাল হইবার নহে। চিকিৎসা বৃথা।" শুনিয়া সকলেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল।

আরও একমাস কাটিয়া গেল। রোগের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। দিনে দিনে বালিকা জখম হইয়া পড়িল। বিষণ্ণ মুখে সকলেই আসিয়া বালিকার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকে। সকলের মধ্যে বিমলার অন্য কাজ নাই। অহর্নিশি তাহার মাথার কাছে বসিয়া কেবল বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে; আর নিঃশব্দে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষের জলে দুই গণ্ড ভাসিয়া যায়। স্বামী ছাড়িয়া পনর দিনের বেশী বিমলা আর কখন বাপের বাড়ী আসিয়া থাকে নাই। বড় মানুষ মুন্সেফ ভায়ের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, আর দরিদ্র ছুতারমিস্ত্রি স্বামীর সামান্য চালাঘর—যদি মা জেদ করিয়া দুই দিন বেশি রাখিতে চেষ্টা করিতেন—সেই অট্টালিকা ছাড়িয়া চালাঘরখানিতে যাইবার জন্য

তাহার প্রাণ ছট্ ফট্ করিত। সেই বিমলা—আজ দুই মাস হইয়া গেল, তবু নড়িতে চাহে না। প্রাণ থাকিতে সে বালিকাকে সে অবস্থায় ফেলিয়া বিমলা আর কোথাও যাইতে পারে না। তাহার শাশুড়ী বৌকে জানিত, কখন তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইত না, বিমলা আপনিই মাকে দেখিয়া সময় মতে শ্বশুর-বাড়ি ফিরিয়া যাইতেন। বধূর আসিতে দুই মাস বিলম্ব দেখিয়া শাশুড়ী ভাবিতা হইয়া এক লোক পাঠাইয়া দিলেন। বিমলা সেই লোকের দ্বারা আগাগোড়া শাশুড়িকে সকল কথা বলিয়া পাঠাইলেন। নিজে গেলেন না।

সে কথা কামিনী শুনিল। বিমলাকে ডাকিয়া বলিল—"বৌ! লোক ফিরাইয়া দিলে!"

বি। হাঁ।

কা। ভাল কর নাই। আজ দুই মাস তুমি তোমার স্বামীকে দেখ নাই; ইচ্ছা করিয়া আর কত দিন না দেখিয়া থাকিবে?

বি। কেহ আজন্ম না দেখিয়া থাকিতে পারে, আর আমি দুই মাস না দেখিয়া থাকিতে পারিব না!

কা। যে কখন স্বামী না দেখিয়াছে, সে থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু তাও কেমন করিয়া পারে জানি না। আর যে একবার সে মুখ দেখিয়াছে,—একবার সে আদর পাইয়াছে—সে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিবে, বোন্?

কামিনীর কথা শুনিয়া বিমলা অবাক্ হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে জানিত এ সব কথার আন্দোলনে তাহার রোগ বাড়িবার সম্ভাবনা। তাই বিমলা বলিল—"ও কথা থাক্, ঠাকুর ঝি। আজ তুমি কেমন আছ?

বিমলার অন্তরের ভাব কামিনী বুঝিল। ঈষ হাস্য করিয়া বলিল —'আজ আমি বেশ ভাল আছি, আজ ঐ কথাই বল, বৌ।'

বিমলা দেখিল, সত্যই আজ তাহার ঠাকুর-ঝি একটু ভাল আছে। দুই মাসের পর আজ বালিকা উঠিয়া বসিয়াছে। দেখিয়া বিমলার হৃদয়ে আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠিল।

কামিনী বলিল—'বৌ, আজ আমার প্রাণের ভিতর বড় কেমন ক'চ্চে। কে যেন কানে কানে বল্‌চে আজ তোর ঠাকুর-জামাই আস্‌বে। দেখিস্, আমি যদি মরি, আমার মাথাটা টানিয়া লইয়া তাঁহার পায়ের উপর ফেলিয়া দিস্।"

বিমলা শীহরিয়া উঠিল। বলিল—'ছিঃ বালাই, ও কথা কেন ঠাকুর ঝি!' বিমলা বালিকার দিকে চাহিল। দেখিল, বালিকা একদৃষ্টে নীচের দিকে রাস্তার উপর চাহিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া কামিনী ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। পারিল না, পড়িয়া গেল। বিমলা কাঁদিয়া বলিল—"ওকি! অমন ক'চ্চো কেন, ঠাকুর ঝি!"

কামিনী বলিল—'বৌ, দেরি করিস্ নে, জানালা দিয়া দ্যাথ্, ঐ তিনি যাইতেছেন; আমার মাথা খা, একবার ডাকিয়া আন্।'

জানালা দিয়া রাস্তার উপর বিমলা চাহিয়া দেখিল। দেখিল, এক জন কৃষ্ণকায় কদাকার ব্রাহ্মণ রাস্তা দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিমলা তাহার ঠাকুরজামাইয়ের রূপ ও আকার প্রকারের কথা শুনিয়াছিল। দেখিয়া, তাহার সে লোক বলিয়া বোধ হইল। আর বিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া বিমলা তাহার মাতাকে গিয়া সকল কথা বলিল। মাতা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, তৎক্ষণাৎ একজন চাকর পাঠাইয়া দিলেন।

বিমলা ও তাহার মাতা কামিনীর গৃহে গমন করিলেন। তখন সে বালিকা চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ছিল। তাহার গৃহে যাইবা মাত্র, বালিকা চক্ষু খুলিয়া গৃহিণীকে বলিল—"মা, আজ আমার সেই টাকা গুলির বড় দরকার, আমাকে আনিয়া দাও।"

গৃহিণী বালিকার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ সে টাকা গুলি আনিয়া বালিকার হাতে দিলেন। দিয়া বলিলেন—"এখন টাকা নিয়ে কি ক'র্‌বে, মা?"

বালিকা কিছু বলিল না। একটু হাসিল।

তার পর বিমলাকে বলিল—"বৌ, আর কেন, একবার ডাকিয়া দাও, শেষ সময়ে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি।"

চীৎকার ছাড়িয়া বিমলা কাঁদিয়া উঠিল।

কামিনী বলিল—"বৌ, কাঁদিও না। আজ আমার বড় সুখের দিন। এ কপালে আবার এমন দিন যে ঘটিবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। একবার ডাক্, বৌ।"

কাঁদিতে কাঁদিতে বিমলা ও তাহার মাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অন্য দ্বার দিয়া চাঁপা সেই ব্রাহ্মণকে সেই ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ তখন ভাবিতেছিলেন—"বল্লালসেনের অক্ষয় স্বর্গ হউক, কি কৌলীন্য প্রথাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বত্র জয়। ভোর বেলা সেই দুর্গাপুর হইতে বাহির হইয়া, কোথায় এই রৌদ্রে ঢিকুতে ঢিকুতে হাঁটিয়া যাইতেছিলাম, না, কোথায় শ্বশুর বাড়ির জামাই—আদর! এ যেমন তেমন শ্বশুরবাড়ি নয়—যে রকম বাড়িখানা ও আর আর সব দেখিতেছি, প্রাপ্তিটা ভাল রকমই হইবার সম্ভাবনা। মর্য্যাদার কথাটা প্রথমেই কাঁড়াইয়া লইবার ইচ্ছা

ছিল, কিন্তু রজপুত দরোয়ানটা যে করিয়া টানিয়া আনিল, ভয়ে আর মুখ দিয়ে কথা সরিল না। যাহা হউক, দেখাই যাক্।"

ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রতিক্ষায় বালিকা বসিয়াছিল, একটু হাসিয়া—একটু মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া—গলায় আঁচল দিয়া ঢিপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ে প্রণাম করিল। তার পর, সেইরূপ গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, দুই ফোঁটা চোখের জলের সঙ্গে অঞ্জলিপূর্ণ সেই টাকা গুলি লইয়া ব্রাহ্মণের পায়ের উপর রাখিল।

ব্রাহ্মণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। এ কি! মর্য্যাদা! এত টাকা! এত টাকা একত্রে ব্রাহ্মণ আর কখন দেখে নাই। সে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে বলিল—"এ টাকা সব কি আমার!"

তখনও বালিকা সেই পায়ের উপর মাথা লুটাইয়া পড়িয়া। এ কথায় কি উত্তর দিবে? নীরবে অজস্রধারে রোদন করিতে লাগিল। চক্ষের জলে ব্রাহ্মণের দুই পা ভিজিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ বলিল—"তুমি কাঁদ কেন? তুমি কে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা বলিল—"আমি আপনার একজন সামান্যা দাসী। আমার দুঃখিনী মা এক দিন আপনার হাতে পাঁচটী টাকা দিতে গিয়াছিলেন, আপনি তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এ টাকা সবই আপনার।"

ব্রাহ্মণের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ জীবনে সে অনেক নিষ্ঠুরের কাজ করিয়াছে, কিন্তু সে দিনকার সে ঘটনার ন্যায় আর বুঝি তেমন কখনও হয় নাই। ব্রাহ্মণ তাহা ভুলিতে পারে নাই। সর্প-দষ্টের ন্যায় ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিল।

তখনও বালিকা সেই পদতলে—নীরব, নিঃস্পন্দ, অসাড়! ব্রাহ্মণও নীরব, নিঃস্পন্দ, হতবুদ্ধি। কতক্ষণ পরে, ধীরে ধীরে হাত ধরিয়া বালিকাকে উঠাইতে গেল। হরি, হরি, হরি! একি! শিরীষকুসুমসুকোমল সে অঙ্গ তুষারবৎ শীতল ও কঠিন! বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া রহিল।

দরজার ছিদ্র দিয়া সকলে এ দৃশ্য দেখিতেছিল। ডাক ছাড়িয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

সব ফুরাইল।

সম্পূর্ণ।



লক্ষ্মী।

Thy time is not yet out—the devil thou servest
Has not as yet deserted thee. Behold
The victim is thy own child !—

Old Play.

লক্ষ্মী।

—++—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তা, কথাটা এই। মন্মথনাথ কলিকাতা হইতে বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিতেছে; বড় নাকি ডাগর বৌ—তার গায় আবার জামা আঁটা। কথাটা যেই শুনিল, সেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

এ বিবাহের বিন্দুবিসর্গও পূর্ব্বে কেহই শুনে নাই। মন্মথের গ্রামে প্রবেশের পূর্ব্বেই কথাটা গ্রামে আগে আসিয়াছিল। সুতরাং তাহা লইয়া গাঁয়ে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ছেলে বুড়ো, মাগী ছাগী সবাই বৌ দেখিতে ছুটিল। গৃহিনী হাঁড়ি নামাইয়া, মেয়ে কুটনা ফেলিয়া, বৌ পানসাজা রাখিয়া, ছেলেরা স্কুল বন্ধ করিয়া, বৌ দেখিতে দৌড়িল। যে চুল খুলিয়াছিল সে অমনি চুল গুলা পুনরায় জড়াইতে জড়াইতে, যে তেল মাখিয়াছিল সে মাথায় কতকটা জল থাবড়াইয়া, যে স্নান করিতেছিল সে ভিজা কাপড়েই—যে যে অবস্থায় শুনিল সে সেই অবস্থায়ই ছুটিল। যাহাদের কথা ফুটে নাই, তাহারাও মার কোলে উঠিয়া বৌ দেখিতে চলিল। মন্মথদের বাড়ীতে আজ আর লোক ধরে না।

মন্মথদের দুই খানি ছোট খ'ড়ো ঘর, আর একখানি রান্না-চালা— চারি দিকে মাটীর পাঁচিল। তাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। এক মা ভিন্ন তার' সংসারে আর কেহই নাই। তাহার শৈশব অবস্থায় তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। পিতাকে বড় তার মনে পড়ে না। বৃদ্ধা পৈতা তুলিয়া, পাট কাটিয়া ছেলেটীকে মানুষ করিয়াছে। মন্মথও বড় ভাল ছেলে ছিল; সে আপনার অবস্থা বুঝিয়া, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। ক্রমে মানুষ হইয়া দুটাকা আনিতে শিখিল, বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না। আজ তাহার সেই মন্মথ বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, মার মনে কত আনন্দ তা কে বলিবে? মন্মথ আসিতেছে শুনিয়া দৌড়িয়া গিয়া বৃদ্ধা পাড়ার পাঁচজন এয়েস্ত্রীকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া শুভকর্ম্মের সব আয়োজন করিয়া দিল। তখন আল্‌পনার ঘটা পড়িয়া গেল। শাঁখের শব্দে ও উলুধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র বাড়ী খানি কাঁপিতে লাগিল। বরক'নে বাড়ী আসিলে একজন গিয়া তাহাদিগকে বরণ করিতে লাগিল। বরণের সব উপকরণ ছিল না, তথাপি যিনি বরণ করিতেছিলেন তিনি আপনার হস্তকৌশল দেখাইয়া উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীকে মোহিত করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিলেন না।

যাহারা বৌ দেখিতে আসিয়াছিল, মাতা তাহাদিগের কাহাকেও "এস মা এস", কাহাকে "এস দিদি এস", কাহাকে "এস বাবা এস" বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় আপশোষ হইল, যে তিনি কাহারও হাতে কিছুই দিতে পারিলেন না। কলি-কাতায় বিবাহের কথা হইতেছিল, ইহাই তিনি পুত্রের মুখে শুনিয়া-ছিলেন; কিন্তু হঠাৎ যে মন্মথ বৌ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে ইহা জানিতেন না। কোন উদ্যোগ নাই। গ্রামেও হঠাৎ কিছু কিনিতে

মিলে না। মাতা বড়ই লজ্জায় পড়িলেন। সে লজ্জা ও কষ্ট জানাইয়া সকলের কাছে ত্রুটী স্বীকার করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাকে বলিল—"তা, লজ্জা কি,'এ তো অন্য পর কেহ নয়। ভাল, বৌভাতে খুব ঘটা করিও।"

মা বলিলেন—আহা, মা, তোমরা ভিন্নই বা আমার মন্মথের আর আছে কে? আশীর্ব্বাদ কর, ভগবান্ যেমন দুটীকে মিলিয়েছেন, যেন সুখে রাখেন।"

তখন, বরণ হইয়া গেলে, চারিদিক্ হইতে—"বৌর মুখ দেখি—বৌর মুখ দেখি" বলিয়া রব উঠিল। যিনি বরণ করিতেছিলেন তিনি বধূর ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইলেন। চাঁদ পানা মুখ। যেমন নাক, তেমনি চোখ। তেমনি কপাল। কপালের উপর তেমনি কাল কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুল গুচ্ছে গুচ্ছে আসিয়া উড়িয়া পড়িয়াছে। কি গড়ন! নিখুঁত, নিটোল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। রূপ দেহে ধরে না। স্বচ্ছ ভাগীরথী-বক্ষে সৌরকরপ্রতিবিম্বের ন্যায় শতধা হইয়া যেন শতদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অথচ তাহা দেখিলে নয়ন স্নিগ্ধ হয়, প্রাণ মন পুলকিত হইয়া উঠে, একবার দেখিলে আরও দেখিতে ইচ্ছা করে, মনুষ্য-শরীরে তেমন রূপ কেহ আর কখন দেখে নাই। বৌ দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সকলে অবাক্ হইয়া গেল। মার বুকখানা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

অনেকে বৌর নাম শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। মাতা কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি, মা?"

বালিকা মুখখানি নত করিয়া বাম হাতের দুটী আঙুল দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"লক্ষ্মী।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর রামহরি মুখুর্য্যের আটচালায় তাস পাঁশা পড়িয়াছে। গ্রামের যাঁহারা চাঁই তাঁহারা একে একে সকলে আসিয়া জমিয়াছেন। এক দিকে "ইস্তক পঞ্চাশ—হাতের পাঁচ" আর এক দিকে "কচেবার—পঞ্জুড়ি" প্রভৃতি শব্দে ক্ষুদ্র আটচালা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রামা চাকরের তামাক সাজিতে সাজিতে প্রাণ অন্ত হইবার যো হইয়াছে। তবে এ আজ নূতন ব্যাপার নয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া,—প্রত্যহই এইরূপ হইয়া থাকে—রামাও অভ্যস্ত হইয়াছে। অনেকে যে কেবল বাড়ী তামাক খরচটা বাঁচাইবার জন্য এখানে আসেন ইহা তাহার বেশ ধারণা ছিল। কিন্তু সেও প্রভুভক্ত ভৃত্য; মনিবের যাহাতে বেশী খরচ না হয় সে দিকে খুব নজর। দশবার ডাক ভাঁড়াইয়া একবার "এজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিত।

খেলা বড়ই জমিয়া আসিয়াছে, খেলোয়াড়েরা তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য—পার্শ্ববর্ত্তী নিষ্কর্ম্মার দল হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া একদৃষ্টে খেলার দিকে দেখিতেছে; এমন সময়ে গ্রামের ন্যায়সিদ্ধান্ত মহাশয় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র রামহরি বাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নীলমণি ঘোষ হাত তুলিয়া বলিল—"প্রাতঃ প্রণাম।"

তখন রামা তামাক দিতে আসিয়াছিল, সে তাহা শুনিয়া বলিল—"তা সাঁজের ব্যালাও পেরাতঃ পেন্নাম বল্‌তি হবে কেন গা, সিদ্ধন্ন মশাই!" রামহরি তাহাকে বকিয়া উঠিলেন। রামা বাহিরে গেল। ন্যায় সিদ্ধান্ত মহাশয় স্বতন্ত্র একখানি চৌকির উপর আসন গ্রহণ করিলেন।

তখন খেলা ফেলিয়া সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। রামহরি বাবু বলিলেন—"অনুমতি করুন!।"

সিদ্ধান্ত মহাশয় টিপের উপর টিপ নস্য লইয়া বলিলেন—"শুনেছ, কাল মন্মথের বৌভাত?"

রা। আজ্ঞে, তা শুনেছি।

সি। তার পর, কি স্থির করলে?

রা। তার আর স্থির অস্থির কি?

সিদ্ধান্ত মহাশয় একটু উগ্রস্বরে বলিলেন—"খেতে যাওয়া হবে?"

তাঁহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সকলে কিছু চমৎকৃত হইল। বাস্তবিক, তাহারা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করে নাই। রামহরি থতমত খাইয়া বলিল—"তা, আপনি কি আজ্ঞা করেন?"

সিদ্ধান্ত আরও রাগিয়া বলিলেন—"আজ্ঞা আবার কি? সে কোথাকার কার মেয়ে বিয়ে করে আন্‌লে তাহার ঠিক্ নেই। বিয়ে করেছে কি নিকে করেছে তাই বা—"

চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কিছু স্পষ্টবক্তা লোক, বলিল—"ছি! ভদ্র লোকের নামে অমন কথা বল্‌বেন না।"

সি। ভদ্র লোক! কে ভদ্রলোক! অতবড় ধেড়ে মেয়ে আইবুড় কি ভদ্র লোকের ঘরে কখন থাকে!

চ। কেন, কোন্ কুলীনের ঘরে নেই! ২৫ বছরের মেয়েরও যে বে হয় না।

সি। চাঁদে আর বাঁদে! কিসের কথায় কি কথা আন হাঁ? কুলীনসন্তান আর মন্মথ! ছিঃ তুমি অতি অর্ব্বাচীন।

উমাচরণ কিছু রসিক লোক, বলিল—"মেয়েটা নাকি আবার জামা গায় দেয়—কি বাহার!"

সিদ্ধান্ত উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"বল, চন্দ্রনাথ ভায়াকে বল। বেবিশ্যে—বেবিশ্যে—নিশ্চয় ও—"

চন্দ্রনাথ বড়ই রাগিয়াছিল, বলিয়া উঠিল—'সিদ্ধান্ত মশাই, আর সিদ্ধান্তে কাজ নেই। উপাধির ছটা আর টিকির ঘটা থাক্‌লেই পণ্ডিত হয় না। বেবিশ্যে নয়-বেশ্যা বল্‌তে হয়। তা, ধর্ম্ম জানেন, সে কি; কিন্তু খুঁজ্‌লে প্রকৃত বেশ্যা অমন—"

সিদ্ধান্ত তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। চন্দ্রনাথের প্রতি সহস্র "বেল্লিক, পাষণ্ড, অনড্বন্‌ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পড়িলেন। কোমরের কাপড় খানা খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইল। রামহরি বাবু দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—"চন্দ্র, তুমি বড় ছেলে মানুষ—থাম না!"

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত মহাশয়কে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইলেন। তখন ভাল হইয়া বসিয়া আর দু টিপ নস্য লইয়া বলিলেন—"দেখ, এ ছেলেমানুষি নয়—এ সমাজের কথা। শাস্ত্রের কথা। আমার মতে ও বৌভাতে কারও যাওয়া উচিত নয়।"

শুনিয়া অনেকে শীহরিয়া উঠিল। রামহরি বলিল—"তবে কি মন্মথকে এক ঘ'রে করিতে বলেন!"

সি। আগুন খেলেই আঙার বমন করিতে হয়।

রা। কিন্তু তার এমন কি দোষ?

সি। রামহরি বাবু, তুমিও ছেলে মানুষ হলে। দোষ নয়—মহৎ দোষ! বৌভাতে গেলে ঐ মেয়ের অন্ন খেতে হবে। কিন্তু ও কার মেয়ে, কি জাতের মেয়ে তা জান? আর এটা বুঝ্‌তে পার না, যদি ভালই হবে, তবে লুকিয়ে বে হবে কেন? বের আগে কেউ একটা কথাই বা জান্‌তে পার্ব্বে না কেন? ভিতরে নিশ্চয়ই গলদ্‌ আছে!"

"অমন প্রকাণ্ড বলদ্ নৈলে কে গলদ্ বার কর্ত্তে পারে বল! দূর হোক!" ঈষৎ অনুচ্চ স্বরে এই কথা বলিয়া চন্দ্রনাথ সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

রামহরি বলিলেন, "কিন্তু—"

সি। আবার কিন্তু কি! আপনার আপনার জাত বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে তো কেহই নিমন্ত্রণে যেও না। ইহাই আমার শেষ কথা।

সিদ্ধান্ত মহাশয় আর বসিলেন না। একেবারে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে দুয়ারের কাছে একটা কুকুর শুইয়া ছিল, সে তাঁহার মূর্ত্তি ও ভঙ্গি দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

সিদ্ধান্ত মহাশয় চলিয়া গেলে মুহূর্ত্তের জন্য সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। তাস পাশা বন্ধ হইয়া গেল। তখন সেই কথারই আন্দোলন চলিল। কু ও সু সকল রকমই লোক আছে, কু ও সু সকল রকমই যুক্তি উঠিতে লাগিল। শেষ স্থির হইল, নিমন্ত্রণে না যাওয়াই শ্রেয়।

পরদিন মন্মথের মাতা যথাসঙ্গতি আয়োজন করিয়া সব প্রস্তুত করিল। আজ তাহার মন্মথের বৌভাত। তাহার আনন্দের সীমা নাই। সেই বৃদ্ধ বয়সেও যেন তাহার যৌবনের বল ফিরিয়া আসিয়াছে। একাই সে কত লোকের রান্না রাঁধিল। সব প্রস্তুত। কেহই আসে না। ডাকিবার জন্য লোক গেল। কেহই আসিল না। লোকের মুখে মন্মথ সব শুনিল। ডাকিয়া মাতাকে তাহা শুনাইল। বৃদ্ধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কতক্ষণের জন্য তাহার মুখে কথা আসিল না। শেষ নিজে মন্মথকে সঙ্গে লইয়া সবাইকে ডাকিতে গেল। কেহই ঘরে নাই। কর্ত্তারা নাই, সুতরাং ছেলেরাই বা যায় কি প্রকারে? কাঁদিতে কাঁদিতে মাতাপুত্রে গৃহে ফিরিল। তখন, সেই রাশীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন কাঙ্গালী ডাকিয়া বিলাইয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আকাশে অনেক রাত্রে চাঁদ উঠিল। চাঁদের আলোয় উঠানে বসিয়া মন্মথ ও তাহার মাতা। মা বলিলেন—"আমার মাথা খা সত্য করে বল্ বাবা, তুই কার মেয়ে ঘরে আন্‌লি।"

ম। আমি তো বলেছি, মা, আমি না জেনে শুনে এ কাজ করি নি।

মা। কিন্তু সবাই যখন চর্চ্চাতে চায়, তখন যে আর আমি মুখ পাইনে।

ম। তাও তো আমি তোমাকে বলেছি, তাই কেন ভেঙে সকলকে বল না।

মা। তা কি বলি নি? কিন্তু কেউ তো বিশ্বাস করে না। যে বরং আগে আমার দিকে টানিত সে এখন বলে—"তোমারই ছেলের দোষ—বাপ মা না থাক্ মেয়ের তিনকুলে কি কেউ নেই, যে আপনার জন বলে পরিচয় দেয়।"

ম। বিশ্বাস করে না! একজনও না!

মা। তবে আর মাথা বল্‌ছি কি! সত্য ক'রে বল্ বাবা, তুই কোথায় ও মেয়ে পেলি।

ম। তবে, তোমারও বিশ্বাস হয় না, মা!

মা। আমি তো, বাবা, অবিশ্বাস করি নি! আ মরি মরি! অমন বৌ কি হয়? মা আমার লক্ষ্মী তো যথার্থই লক্ষ্মী! যেমন রূপ তেমনি গুণ! কি কথা, কি কাজ কর্ম্ম, বের ক'নে—এখনই কত যত্ন আয়িত্যি! এমন বৌ নিয়েও আমি দুদিন সুখে ঘর কর্ত্তে পার্ল্লেম না! বিধাতা কি এ কপালে কেবল ছাই গুলে লিখেছিলেন!

একেবারে সহস্র দুঃখের কথা তাঁহার মনে পড়িল। আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দুই চক্ষে জলধারা বহিল। চাঁদের আলোয় মন্মথ তাহা দেখিল। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল—'কেঁদো না মা, কেঁদো না। এ সব আমারই অদৃষ্টের ফের, নহিলে কেন এমন ঘটনা ঘটিবে? তুমি জানিবে না, অন্য কেউ জানিবে না, কেন আমি বিয়ে ক'রে আসিব? বিয়ে ক'রে আসিলাম তো এ অভাবনীয় ব্যাপারই বা কেন ঘটিল? পরিচয় দিবার একজনই বা রহিল না কেন? এ সকলই, মা, ভগবানের খেলা!'—

মন্মথের কান্না আসিয়াছিল; কণ্ঠ বাষ্পপীড়িত হইয়াছিল। মা বলিলেন—"চুপ কর বাবা। ছিঃ বেটা ছেলে, তোমার কান্না কেন? ধর্ম্মপথে থাকিলে কখন মন্দ হবে না।"

ম। মা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিসে হয় কেমন করিয়া বুঝিব? শুন তবে, সে সব কথা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি। বাসার কাছে একজন ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটী কন্যা। ব্রাহ্মণ অতি শান্ত, সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান্। পূজাহ্নিকেই দিনের প্রায় সকল সময় কাটিয়া যাইত। যে টুকু অবকাশ তাহা সদালাপে ও শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত হইত। আমি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইতাম। তাঁহার উপদেশপূর্ণ কথাগুলি শুনিতে বড়ই ভালবাসিতাম। তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাটীর ভিতরেও আমার যাইতে নিষেধ ছিল না। কন্যাটী বাপের কাছে পাঠ অভ্যাস করিত, কখন বা আমি গিয়া পড়িলে আমরা দুজনেই শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতাম। এক দিন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী দুজনেই তাঁহাদের কন্যাটীকে আমার সহিত বিবাহ দিবার কথা পাড়িলেন। তখন আমি কিছুই বলিতে পারি নাই, বলিয়াছিলাম 'মাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি

না।' তার পর বাড়ী আসিয়া তোমায় বলিলাম। শুনিয়া তুমি রাজি হইলে।

মা। তাত জানি বাবা, কিন্তু তার পর আর একটী কথাও না জানাইয়া, কেন এ কাজ কর্‌লি যাদু?

ম। শুন মা, সে দোষ আমার নয়। বিধাতার ইচ্ছা—আমার কি সাধ্য তাহার বিপরীতাচরণ করিব? তুমি রাজি হইলে পর, আমি গিয়া তাঁহাদিগকে সে কথা বলিলাম। তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে আমি তাঁহাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত বন্ধ করিলাম। একদিন আফিষ হইতে আসিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে একজন লোক আমায় ডাকিতে আসিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমায় শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন. তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু উপস্থিত। তাড়াতাড়ি গেলাম। ব্রাহ্মণীর ওলাউঠা হইয়াছিল, একদিনেই শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছে। তখন শ্বাস টানিতেছে। তখন ধরাধরি করিয়া বাহির করিলাম। তুলসীতলায় শুইয়া, অতিকষ্টে ব্রাহ্মণী আমার দিকে একবার সজলনেত্রে চাহিলেন, আমি মুখের কাছে কান লইয়া গেলেম। বলিলেন, "হাত।" আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। শিওরের কাছে তাঁহার কন্যা বসিয়া কাঁদিতে ছিল, ধীরে ধীরে তাহার হাত খানি লইয়া আমার হাতের উপর রাখিলেন। একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। চোখের তারা স্থির হইল। ব্রাহ্মণী স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সে দৃশ্য এখনও যেন চোখের উপর দেখিতেছি। মনে করিলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

মা। বলিস্ কি বাবা! তার পর—তার পর?

ম। তার পর ব্রাহ্মণীর সৎকার হইয়া গেল। আট দিন পরে একদিন ব্রাহ্মণ আমায় বলিলেন,—"মন্মথ, আজ দিন ভাল, আজই

গোধূলি লগ্নে তোমার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। তোমার কি মত?" আমি বলিলাম "মা জানিলেন না, কাহাকেও বলা হইল না।" তিনি বলিলেন "তোমার মা তো রাজি আছেনই।" তখন আমি বলিলাম—"সবে আজ আট দিন আপনার স্ত্রী গত হইয়াছেন, কালাশৌচ, এখন বিবাহ কেমন করিয়া হইবে?"

মা। ও মা সত্যই তো। তাতে তিনি কি বল্লেন?

ম। তিনি বলিলেন, "তবে শোন মন্মথ. এটী আমাদের কন্যা নহে, পালিতা কন্যা। দুই বৎসরের সময় কাশীতে আমি ইহাকে পাই। রাঢ়ীয় শ্রেণী এক ব্রাহ্মণ এই কন্যাটী লইয়া সস্ত্রীক কাশী গমন করেন। আমি তখন সেইখানেই থাকি। তাঁহারা এক রাত্রি আমার নিকটে অবস্থিতি করেন, পরদিন প্রভাতে নৌকারোহণে দেশ যাত্রা করেন। সে দিন আকাশে বড় মেঘ উঠিয়াছিল। আমি অনেক মানা করিলাম, না শুনিয়া নৌকায় উঠিলেন। তার পর ঝড় উঠিল। সে নৌকার কি হইল জানি না; কিন্তু স্নানের সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়াইয়া যখন সন্ধ্যা করিতেছিলাম, তখন দেখিলাম একখানি কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে, কাঠের উপর একটী শিশু কন্যা। দেখিবামাত্র চিনিলাম—এ সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা। সাঁতারিয়া তাহা ধরিয়া তীরে উঠাইলাম। অনেক সুশ্রূষায় কন্যাটীর চেতনা হইল। বাড়ী লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণীকে দিলাম। কন্যাটীকে আপনার অধিক করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলাম। তার পর ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, কোন উদ্দেশই পাই নাই। ক্রমে কন্যাটী বড় হইল। কার্য্যগতিকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণী চলিয়া গেল; আর সংসারে থাকিতে বাসনা নাই। কন্যাটীকে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশী-

ধামে ফিরিয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে এ জীবনের শেষ বোঝা নামাইব ইচ্ছা করিয়াছি।” শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।

মা। অবাক্ হবারই তো কথা। এ যে বাবা, রূপকথার মত। তার পর?

ম। আমি তো কিছুই বলিতে পারিলাম না। যথালগ্নে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। দুই দিন পরে ব্রাহ্মণ কাশী চলিয়া গেলেন। আমি তোমার দাসী লইয়া তোমার নিকট আসিলাম। তোমার কাছে, মা, আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি; কিন্তু ধর্ম্ম করিয়াছি কি অধর্ম্ম করিয়াছি তাহা বলিয়া দাও।”

মা সব শুনিলেন। বুঝিতে তাঁহার কিছু বাকি রহিল না। কিন্তু লোকে তো তেমন বুঝে না। বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল।

দেখিয়া মন্মথ বলিল—“কাঁদিতেছ, মা?”

মা। সাধে কাঁদি, বাবা! কি করি তাই ভাবিতেছি। ইচ্ছা করে যে পোড়া দেশ থেকে এখনই আর কোথাও উঠে যাই।

ম। কোথায় যাব, মা? যদি কলঙ্কই না গেল, তবে দেশ ছাড়িয়া গিয়া কি করিব?

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

মন্মথ বলিল—“সকলে কি বলে?”

মা। পোড়া লোকের কথা আর বলিব কি? বলে, মন্মথ ও বৌ ত্যাগ করুক; মন্মথের বিবাহের ভাবনা কি!

মন্মথ আর কিছু বলিল না। বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। নৈশ সমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই বায়ুর সঙ্গে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মিশাইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র গৃহের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বিছানা। সেই বিছানায় শুইয়া—লক্ষ্মী। মাথার কাছে জানালাটী খোলা। চাঁদের আলো আসিয়া বিছানার উপর পড়িয়াছিল। চন্দ্রের রশ্মি বালিকার মুখে, চুলে ও সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া খেলা করিতেছিল। কখন বা রশ্মিগুলা একত্রে এক স্থানে জড় হইয়া ভাবিতেছিল, তাহাদের স্পর্শমাত্রেই তো পদ্ম মুদিয়া যায়, কিন্তু আজ এ পদ্মটা তাহারা যতই নাড়িতেছে চাড়িতেছে, ততই ইহা মুদ্রিত না হইয়া ক্রমশঃ আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে কেন?

বালিকা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে; চুলগুলি গোছায় গোছায় থাকিয়া থাকিয়া মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; মৃদুবায়ুস্পর্শে ধীরে ধীরে ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে; ঈষদুদ্ভিন্ন অধরৌষ্ঠ যুগল মধ্যে মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় দন্তরেখা দেখা যাইতেছে; অলসে একখানি হাত নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে;—মরি মরি কি রূপ! চন্দ্রকরে রঙ্ যেন আরও ফাটিয়া পড়িতেছে। সে ক্ষুদ্র গৃহ আলো হইয়া রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অতৃপ্তলোচনে মন্মথ সে রূপরাশি দেখিতে লাগিল। পা নড়ে না, চক্ষু ফেরে না। সব ইন্দ্রিয় অবশ। ~~দেখিতে~~ দেখিতে দেখিতে মন্মথের চক্ষে ফোটা ফোটা করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। চক্ষু মুছিয়া আবার মন্মথ দেখিতে লাগিল। আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

এই বালিকা—সরল, নির্দ্দোষ, পবিত্র—কিছুই জানে না, সংসারের কোন রৌদ্র এখনও পোহায় নাই—আপনার যে হৃদয়ের দুঃখ তাহা আপনিই নীরবে হৃদয়ে বহন করে, কাহাকেও বলে না, কাহাকেও

জানায় না—আপনার আশা ভরসা, সুখ শান্তি, সকলই একজন অপরিচিতের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত—মুখে চিন্তার ছায়া মাত্র নাই, অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে;—এই দেববালার স্বামী হইবার যোগ্য কি অধম সংসারের কীট মন্মথ! বিধাতা, কেন এমন মিলন করাইলে? যে চির-দরিদ্র তাহাকে কেন এ দেবদুর্ল্লভ রত্নের লোভ দেখাইলে? ছি ছি! মন্মথ মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিল, শতবার আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—"হে সমাজ, এ বালিকা তোমার কে? তোমার জন্য কত লোক আছে, এ ক্ষুদ্র বালিকাকে তোমার দলাদলির কুটিল চক্রে পিষিয়া কি ফল? নিরপরাধে ইহাকে বধিয়া তোমার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে?" চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বালিকা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিতেছিল যেন, তাহার মা আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন—'আয় বাছা, এখানে আর থাকিস্‌নে, আমার সঙ্গে চলিয়া আয়।' স্বপ্নে বালিকা 'মা মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, শিওরের কাছে দাঁড়াইয়া মন্মথ। মন্মথ নীরবে নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বালিকা স্বামীর হাত ধরিল। বলিল —"ও কি! অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন?"

মন্মথ কথা কহে না।

"বল না—মাথা খাও, বল না।"

তবু মন্মথ কথা কহে না। কথা কহে না, কাঁদে।

তখন বালিকা স্বামীর হাত ধরিয়া বিছানায় আনিয়া বসাইল। বালিকাসুলভ আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞাসিল—"বল, তোমার পায়ে পড়ি, কি হইয়াছে, বল।"

মন্মথ বলিতে গেল ; কিন্তু পারিল না। শুইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা বিষম দায়ে পড়িল। কিছু বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণেক পরে সে নিজে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কতক্ষণ পরে মন্মথ বলিল—"ছি! কাঁদিতেছ কেন ?"

"তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

"আমি অভাগা তাই কাঁদিতেছি, কিন্তু তুমি কাঁদিবে কেন ?"

"তুমি কাঁদাইতেছ তাই কাঁদিতেছি, নহিলে তোমার কাছে থাকিয়া কেন কাঁদিব ?"

মন্মথ বালিকার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বলিল—"তবে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিয়া উঠিলে কেন ?"

"সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

কি স্বপ্ন মন্মথ তাহা শুনিবার জন্য জেদ করিল। বালিকা তাহা বলিল। শুনিয়া মন্মথ শিহরিয়া উঠিল। বালিকা বলিল—"তা, ও কিছু নয়। স্বপ্ন কি কখন সত্যি হয় ? বাবার মুখে শোন নি !"

মন্মথ আবার তাহার মুখের প্রতি চাহিল। বালিকার সরল প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। আবার আপনার উপর ধিক্কার জন্মিল। আবার মন্মথ কাঁদিল।

তখন, বালিকা কথাটা শুনিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। মন্মথ কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। মার সঙ্গে তার যে কথা হইয়াছিল তাহা সমস্তই বলিল। স্থির হইয়া বালিকা সমস্তই শুনিল। শেষ কথাটী আরও স্থির হইয়া শুনিল। স্থির হইয়া বলিল—"তার পর, তুমি কি ঠাওরাইলে ?"

মন্মথ উত্তর করিল না।

বালিকা গম্ভীরে বলিল—"অন্য মত করিও না, যাতে সব দিক বজায় থাকে তাই কর। আমি কোন্ বাঁদির বাঁদি, আমার জন্য কেন আপনি মজিবে ও মাকে মজাইবে?"

শুনিয়া মন্মথ অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, এ কি বালিকা! বলিল -"তুমি বে'র ক'নে, ছেলে মানুষ; ছেলে মুখে তোমার এ সব বুড়ো কথায় কাজ কি?"

বালিকা ঈষৎ হাসিল। বলিল—"বাবা কি বলিতেন মনে পড়ে!"

"কি?"

"কর্ত্তব্যের কাছে, ধর্ম্মের কাছে ছেলে বুড়ো নাই। পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুব বনে বসিয়া হরিনাম সাধনা করিয়াছিল। বালক প্রহ্লাদ হাতে খড়ির দিন 'ক'য়ে কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছিল; শিশু বৃষকেতু খেলা ছাড়িয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে পিতার করাতের নীচে মাথা পাতিয়া দিয়াছিল; বেহুলা বিবাহরাত্রে মৃতস্বামীর গলিত শব বুকে বাঁধিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—সে সব কথা মনে পড়ে না? পুরাণের সে সব বিষয় ভুলিয়া গিয়াছ কি? আমি বালিকা হই আর শিশুই হই, তোমার ধর্ম্মপত্নী, তোমাকে ধর্ম্মের কথা কেন না বলিব?"

মন্মথ নির্ব্বাক, হতবুদ্ধি। এই বয়সে এত জ্ঞান! এ কি বালিকা, না কোন্ স্বর্গভ্রষ্টা দেববালা! হা ভগবন্! এমন রত্ন দিয়াও তাহা কাড়িয়া লইতেছ! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মন্মথকে ছলিবার জন্যই কি ইহাকে ইহার মধ্যে এত রূপে গুণে সাজাইয়াছিলে? বোধনের দিনে কেন বিজয়ার বাদ্য বাজাইলে? সহস্র পাষণ্ড হইলেও আমি কেমন করিয়া এ স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিব? এ কি বিষম পরীক্ষা, প্রভো! মন্মথ বালিকার যতই গুণের কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়

ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে হৃদয় বাঁধিয়া বলিল—"এস. লক্ষ্মি, রাত হইয়াছে, এস আমরা শুই।"

দুই জনে দুই জনের পাশে শুইয়া পড়িল।

* * * *

প্রভাতে মন্মথ উঠিয়া দেখিল, লক্ষ্মী নাই। উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ খুঁজিল; দেখিতে পাইল না। ঘাটে, পথে, রান্নাঘরে কোথাও লক্ষ্মী নাই। মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতর ধড় ধড় করিতে লাগিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধা আকাশ হইতে পড়িল। 'সে কি—বৌমা কোথায়?' বৃদ্ধা আতি পাতি করিয়া নানা স্থান অন্বেষণ করিল, লক্ষ্মী নাই। উন্মাদিনীর ন্যায় কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, তাহাদের দুই জনে কোন কথা হইয়াছিল কি না। যে কথা হইয়াছিল, তাহা সব মন্মথ মাকে বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধা কপালে কর হানিল। বলিল—"হা বিধাতঃ! আমার এমন বাড়া ভাতেও ছাই দিলে! সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী আমার ঘরে আসিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আমি অভাগী কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!" ক্রমে কথাটা গ্রামময় হইয়া গেল। যে শুনিল, সেই বিস্মিত হইল। মুখে মুখে কথাটা অনেকটা উপন্যাসের আকার ধারণ করিল। ক্রমে সবারই দৃঢ় প্রত্যয় হইল, যথার্থই লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সঙ্গে কলহ করিয়া বৈকুণ্ঠ-পুরী হইতে ছলিতে আসিয়াছিলেন। অনেকে হায় হায় করিতে লাগিল, কেন তাহারা ধনপুত্রে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বর মাগিয়া লইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড রোদ। দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মাথার উপর আগুন ঢালিতেছে। পৃথিবী যেন কামারশালা। এ সময়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল বড় ভয়ানক। কাহার সাধ্য মধ্যাহ্নে সেখানে বাহির হয়? বালুকার এক একটী কণা যেন এক একটী সূচশলা। তার উপর অবিরত লূ চলিতেছে। সে বায়ু লাগিলে গা পুড়িয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পড়ে। পশ্চিমের সুখ অনুভব করিতে চাও ত শীতকালে যাইও, এ সময়ে সোণার বাঙ্গালা ছাড়িও না।

এ ছাড়া পশ্চিমে এ সময়ে আরও ভয়ের কারণ আছে। ওলাউঠার বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়; বসন্তে বিস্তর লোক মারা পড়ে। দুই-ই উৎকট রোগ, দুই-ই এ সময়ে এ প্রদেশকে ছারখার করিয়া ফেলে। ওলাউঠা অপেক্ষা বসন্তের প্রভাব আরও কিছু বেশী। ভগবান্ এ সুখের সৃষ্টি রচনা করিয়া কেন তাহা দুঃখের আলয় করিলেন তাহা একরূপ বুঝিতে পারি; মানুষকে স্বহস্তে গড়িয়া কেন তাহাকে মৃত্যুর অধীন করিলেন তাহাও কতকটা বুঝিতে পারি; কিন্তু দয়াময় হইয়া তিনি এমন যন্ত্রণা-ময় ব্যাধির কেন সৃষ্টি করিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এ বৎসর অম্বালায় বসন্তের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সকল লোকেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টও ইহা নিবারণের জন্য যতটা উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা করিতেছেন। তবে কারপর-দাজদিগের দোষে বা গুণে সকল নিয়মগুলা ঠিক পালন হইয়া উঠিতে-ছিল না, বা অতিপালন হইতেছিল। অম্বালার যেখানে ছাউনি—ক্যাণ্টনমেণ্ট—তাহা সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ। বসন্ত আগেই ছাউনিতে আরম্ভ হইয়াছে। বসন্ত ছোঁয়াচে রোগ; তাই ছাউনির

নিয়ম, বসন্ত হইলে রোগী সেখানে থাকিতে পারে না। দূরে মাঠের এক ধারে তাহাদিগের থাকিবার একটা নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে। ভিক্ষুক হইতে ধনকুবের পর্য্যন্ত সবারই সে অবস্থায় এই আশ্রয়। এইখানে সরকারি ডাক্তার ও লোক জন আছে, তাহারাই দেখে শুনে। তবে কাহারও কেহ আত্মীয় সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারে; কিন্তু রোগীর ন্যায় সেও সে কয় দিন ছাউনিতে আসিতে পারে না।

বেলা দুই প্রহর। সেই রোগনিবাসে অনেক গুলি রোগী শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। কেহ নীরবে কাঁদিতেছে, কেহ মরণাধিক যাতনায় চীৎকার ছাড়িতেছে, কেহ বা অজ্ঞানে প্রলাপ বকিতেছে। মৃত্যু যেন সবারই আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মধ্যে যে একটু সৌভাগ্যশালী তাহার কোন আত্মীয় মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বীজন করিতেছে, আর রোগী অপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্টে এক একবার মর্ম্মস্থল হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। যাহারা বিদেশী, কর্ম্মোপলক্ষে এখানে প্রবাসী মাত্র, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য আর নাই। এক একবার ঘর বাড়ী, স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা মনে পড়িতেছে, এক একবার পার্শ্বস্থ শূন্য শয্যার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে—কাল যে ঐ বিছানায় শুইয়া তাহারই সহিত একত্রে এমনি ছট্ ফট্ করিয়াছে আজ সে নাই,—সে খালি বিছানা দেখিয়া আপনার অবস্থা স্মরণ হইতেছে, আর অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুর পর অশ্রু নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িতেছে। সে দৃশ্য বড় মর্ম্মস্পর্শী—তাহা লিখিয়া ঠিক্ বুঝান যায় না।

সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটী শয্যায় পড়িয়া এক বাঙ্গালী যুবক। সে একজন কমিসারিয়াটের কেরাণী। ছয় মাস হইল, কলিকাতা হইতে এখানে বদলি হইয়া আসিয়াছে। আপনার জন এখানে তাহার কেহই

নাই। কয়েকজন বাঙ্গালী মিলিয়া একত্রে এক বাসা করিয়া ছিল। তাহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, অতি ধীর শান্ত মিষ্টভাষী। কাহারও কোনও কথায় থাকিত না, আমোদ আহ্লাদে বড় একটা মিশিত না, সদাই আপন মনে কি চিন্তা করিত,এবং আপিষের কাজ সারিয়া নির্জ্জনে আপনার সেই চিন্তা লইয়াই থাকিতে ভাল বাসিত। সবাই তাহাকে স্নেহ করিত, এবং তাহার অন্তরে অন্তরে কি একটা গভীর বেদনা আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া অনেকে তাহার জন্য সহানুভূতি করিত। হঠাৎ এক-দিন আপিষ হইতে আসিয়া গা ব্যথা করিতেছে বলিয়া সে শুইয়া পড়িল। রাত্রে আর উঠিল না। প্রভাতে সবাই দেখিল, তাহার বসন্ত হইয়াছে। দেখিয়া সকলে শীহরিল। হুকুম ছিল, বসন্ত হইবামাত্রই কোতয়ালিতে সংবাদ দিবে। কিন্তু যদি অল্পে অল্পে সারিয়া যায় এই ভাবিয়া "চুপ চুপ" করিয়া সে দিন সবাই কথাটা চাপিয়া রাখিল।

পর দিন কিন্তু আর চুপে চুপে গেল না। রোগ একদিনেই বড় বাড়িয়া উঠিল। যে ডাক্তার প্রথম দিন অনেক অনুনয়ের পর গোপনে দেখিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, সে আজ আর গোপনে দেখিতে চাহে না। কাজেই অনেক চিন্তার পর, থানায় জানাইল। তৎক্ষণাৎ লোক আসিয়া ধীরে ধীরে উঠাইয়া তাহাকে সেই প্রান্তরস্থিত রোগ-নিবাসে লইয়া চলিল। যাইবার পূর্ব্বে একবার সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সুশ্রূষার জন্য বাড়ী হইতে কাহাকেও আসিতে টেলিগ্রাফ করিবে কি না। কিন্তু সে তাহার উত্তরে কিছুই বলিল না, দুই চক্ষের কোণ দিয়া দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া সবাই যার পর নাই ব্যথিত হইল।

এ অভাগা আর কেহই নহে, মন্মথ। আমরা দুই বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর পরের কথা! এক দিনে—এক ঘণ্টায়—এক মুহূর্ত্তে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তা দুই বৎসর!—কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তা কে বলিবে? আজ যেন মন্মথের পীড়া, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে মন্মথ সেই মন্মথ কি ছিল? সেই হাসি-হাসি সদাপ্রফুল্ল সুন্দরকান্তি মন্মথ কি হইয়া গিয়াছে! আর তাহার সে হাসি নাই, সে প্রফুল্লতা নাই, সে কান্তি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে মন্মথ বৃদ্ধের আকার ধারণ করিয়াছে। মুখ বসিয়া গিয়াছে, কপাল কোঁকড়াইয়া আসিয়াছে, দেহে কালি মাড়িয়া দিয়াছে।

কিন্তু এ তো সব বাহ্যিক পরিবর্ত্তন; তাহার মনের পরিবর্ত্তন আরও ভয়ানক। সেখানে সুখ নাই, শান্তি নাই। সদাই হা হুতাশ, সদাই তীব্র বিষের জ্বালা। বুকের ভিতর কি যেন ফুটিয়া রহিয়াছে; তাহা উঠে না, নামে না—বড় ব্যথা, বড় যাতনা—নিশ্বাস ফেলিতেও বাজিয়া উঠে। আর মা? আহা! সে অভাগিনীর কত কষ্ট তাহা কে বলিবে? বুড়ী 'বৌ বৌ' করিয়া এক রকম পাগল হইয়া গিয়াছে। এখনও ঘাটে ঘাটে পথে পথে লক্ষ্মীর সন্ধান করিয়া বেড়ায়। পথ দিয়া কোন স্ত্রীলোক যাইতে দেখিলে হা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। সে চলিয়া যায়, আর বুড়ী আপন মনে কাঁদিতে থাকে। সেই মার জন্য মন্মথ ভাবিয়া বড়ই কাতর হইল।

দুঃখ একা আসে না। দুঃখ দুঃখকে সঙ্গে লইয়া আসে। সহসা অম্বালায় বদলির হুকুম হইল। একে চাকুরিতে আর প্রবৃত্তি নাই, তায় বিদেশে—যাই কি না যাই, মন্মথ অনেক ভাবিল। এক পয়সা সঙ্গতি নাই, দুদিন বসিয়া খাইলে চলে না। কিন্তু, মন্মথ নিজের

জন্য ভাবে না। বুড়া মা—কোথায় যাইবে? পেটের জন্য এ বয়সে কার দোরে ভিক্ষা করিবে? মন্মথ অম্বালায় যাইতে স্বীকৃত হইল। মাকে সব বলিল। মা সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। মন্মথ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার অধিক দূর কখন যায় নাই। বিদেশের কোন তত্ত্বই জানে না, মন্মথের সাহস হইল না। মাকে অনেক বুঝাইল। বৃদ্ধা দেবতার নিকট পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাথা কুটিতে লাগিল। তার পর, মার আশীর্ব্বাদ লইয়া মন্মথ বিদেশ যাত্রা করিল।

আজ দুই দিন হইয়া গেল মন্মথ এই রোগনিবাসে আসিয়াছে। দুই দিনে পীড়া ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। মুখ চোখ কোথাও আর স্থান নাই, সর্ব্বাঙ্গ বসন্তে ভরিয়া গিয়াছে, অসীম যাতনায় বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া কত কথা মনে পড়িতেছে। 'সেই মা! না জানি তিনি কত কষ্টই পাইতেছেন। আর মন্মথ যদি সত্য সত্যই না বাঁচে, তাঁহাকে কে দেখিবে? এ শেষ বয়সে কে মুখ চাহিবে? দুটো সান্ত্বনার কথা বলিবার যে কেহই নাই! হয় ত এ সংবাদে তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন—উঃ সে কি ভয়ানক!' মন্মথ আর ভাবিতে পারিল না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল।

আবার কতক্ষণে সেই বালিকার কথা মনে আসিল। 'লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী কি এ পৃথিবীতে আর নাই! দুই বৎসর এত চেষ্টার পরও কেন সন্ধান মিলিল না! আ মরি মরি, কি রূপ! রূপের অপেক্ষা কি গুণ! প্রাণ থাকিতে তাহা কি ভোলা যায়?' সেই রাত্রির সব কথা গুলি একে একে মনে জাগিয়া উঠিল। দুই বৎসরে মন্মথ তাহার এক বর্ণও বিস্মৃত হয় নাই। তখন রোগের যাতনা বাড়িয়া উঠিল। হতভাগ্য বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

রোদন করিতে করিতে একটু তন্দ্রা আসিল। মন্মথ ঘুমাইয়া

পড়িল। কিন্তু সে ঘুম শীঘ্র ভাঙ্গিল না। তাহা ঘুম নহে, অচৈতন্য। প্রাতঃকালে মন্মথ কাঁদিতেছিল, দুই প্রহরের সময় সকলে দেখিল, সে অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে। তখন যে সময় কেহ যে আপিষে গিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিবে তাহাও পারে না। ভয়ানক ঝড়—কার সাধ্য ঘরের বাহির হয়? ব্যথিতহৃদয়ে সবাই তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

সূর্য্য যেন আজ তাহার সকল কিরণ ঢালিয়া দিবে সংকল্প করিয়াছে। বিষম রৌদ্র। ঝড়—অবিরাম চলিতেছে, সে বায়ুর সঙ্গে তপ্ত বালুকণা উড়িতেছে, বায়ু যেন আগুন খেলাইতেছে। গাছগুলা শুখাইয়া আপনা আপনি ফাটিতেছে। ঘাট মাঠ সর্ব্বত্র জনহীন। এ সময়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়া কে ঐ রমণী ছুটিয়া আসিতেছে? সন্ন্যাসিনী বেশ; পরিধানে গৈরিক বাস, হাতে ত্রিশূল, কেশপাশ আলুথালু, তাহা ভস্মমাখা। এখনও সব চুলে জটা পড়ে নাই, দুই এক গাছায় ধরিয়াছে মাত্র। দেখিলে বোধ হয় এ অতি অল্প দিন এ বেশ ধারণ করিয়াছে। সূচশলার ন্যায় বালুকণা সকল পায়ে বিদ্ধ হইতেছে, বায়ু লাগিয়া অঙ্গ ঝলসিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সন্ন্যাসিনী দ্রুতপদে সেই রোগ্‌-নিবাসের দিকে ছুটিয়াছে। ঘরে প্রহরী বসিয়াছিল, সন্ন্যাসিনী আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাকে কি বলিল। প্রহরী দর্শনমাত্রেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। ভাবিতেছিল, "ভগবতীজি কৈলাস ছোড়্‌কে আয়া হোগা।" প্রহরী সসম্ভ্রমে প্রণামান্তে "আইয়ে মায়ি" বলিয়া পথ দেখাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া চলিল।

সন্ন্যাসিনী গৃহের মধ্যে আসিয়া যেখানে মন্মথ অচেতনে পড়িয়াছিল, তাহার শিওরের কাছে বসিল। ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। প্রহরী বৃথায় অনুমান করে নাই। সবাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসিনীর বয়স ষোলর উপর হইবে না। কাঁচা সোণার রঙ্, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপ, তবু যেন সে রঙ্ ফাটিয়া পড়িতেছে। রূপ দেহে ধরে না। ভগবতী নহিলে এ বয়সে এতরূপ লইয়া কে সন্ন্যাসিনী সাজিবে? তিনি দয়াময়ী, অনাথের গতি, তাই দয়া করিয়া এই অনাথের ভার আপনিই লইতে আসিয়াছেন। মানুষের সাধ্য কি, এই ঝড়ের ভিতর দিয়া এই বালির উপর দিয়া চলিয়া আসে? সম্ভ্রমে সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনী কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে মন্মথের মাথাটী লইয়া আপনার কোলের উপর রাখিল। ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

তিন দিন মন্মথ এইরূপ অঘোর অচেতন হইয়া রহিল। তিন দিন সন্ন্যাসিনী সেই একই স্থানে এক ভাবে বসিয়া তাহার সুশ্রূষা করিল। এ তিন দিনে কেহ তাহাকে একটীও কথা কহিতে শুনে নাই, কেহ তাহাকে একবার চক্ষু বুজাইতে কি নড়িয়া বসিতে দেখে নাই; তিন দিন বিন্দু মাত্র জল পর্য্যন্ত সে গ্রহণ করে নাই। অনেকের তাহাকে কিছু খাওয়াইবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না।

তিন দিন কাটিয়া গেল। ঈশ্বরের কৃপায় হউক, সুশ্রূষার গুণে হউক, এই তিন দিনের অচেতন অবস্থায়ই মন্মথ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। চারি দিনের দিন মন্মথের চেতনা হইল। প্রভাতে সবাই দেখিল, মন্মথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে, অধিকাংশ বসন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ে সকলে দেখিল, সে সন্ন্যাসিনী আর নাই। মন্মথকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই বলিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তখন সকলে সেই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

পর দিন মন্মথ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মন্মথ সুস্থ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার মনের সুস্থতা হইল না। সে আরোগ্য লাভ করিয়া বাসায় আসিলে বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বেই এ কথা শুনিয়াছিল। এ সব কথা বড় একটা গোপন থাকে না।

মন্মথ কিন্তু কাহারও কথার কিছু উত্তর দিতে পারিল না, মনে মনে কেবল তোলাপাড়া করিতে লাগিল। নির্জ্জনে একদিন ভাবিল, 'সবাই তো সে একই কথা বলিতেছে, তবে কি সত্য? কিন্তু সে সন্ন্যাসিনী কে? তিন দিন অনাহার অনিদ্রা—নড়িয়া বসে নাই, জলবিন্দু গ্রহণ করে নাই—এ কি মানুষে পারে? মানুষের কথাই বা ভাবি কেন, আমি অভাগা, আমার প্রতি এত দয়া কে করিবে? তবে কি সত্য সত্যই এ কোনও দেবীর কাজ?' তাহা ভাবিতে মন্মথ শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু—আবার ভাবিতে লাগিল,—কিন্তু যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ে কার একখানি মুখ তাহার মুখের উপর সদাই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, সেই স্বপ্নের মত সে চোখে সে যেন দুই এক বিন্দু জলও দেখিয়াছিল। সে কি? সে মুখ ঠিক্ মনে পড়ে না—লোকে যাঁহার কথা বলে, সে কি তাঁহারই মুখ! মন্মথ ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ মন্মথের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল। সে মুখ—সে মুখ কি লক্ষ্মীর!

লক্ষ্মীর!—নহিলে এত দয়া এত গুণ কার? তবে কি লক্ষ্মী আজও এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে? লক্ষ্মী সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে? তাহার সেই লক্ষ্মীর আজ এই বেশ হইয়াছে?—না না, এ নিতান্ত অসম্ভব। আর তাই যদি হয় মন্মথ অম্বালায় মাঠের মধ্যে হাঁসপাতালে পড়িয়া,

সে সংবাদই বা লক্ষ্মী পাইল কোথা হইতে, এবং এখানে আসিলই বা কি রকমে? না না, এ নিশ্চয় কোনও দেবীর ছলনা! সে বিকারে লক্ষ্মীর কথা ভাবিতে ভাবিতে কি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে।

'কিন্তু—কিন্তু'—মন্মথ আবার ভাবিল, "কিন্তু, যে একবার সে মুখ দেখিয়াছে সে কি আর ভুলিতে পারে? সে তো লক্ষ্মী! যথার্থই লক্ষ্মী! আমারই লক্ষ্মী! হায় হায়! কেন তখন তাহাকে চিনিতে পারিলাম না? কেন ধরিয়া রাখিলাম না? কোথায়—কোথায় গেলে তুমি! লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—" মন্মথ চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। নির্জ্জন গৃহে সে শব্দের প্রতিধ্বনি হইল মাত্র। কে তাহার ডাকে উত্তর দিবে? মন্মথ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

সেই দিন মন্মথের মাতার একখানি পত্র আসিয়াছিল। তিনি তাহার সংবাদ না পাইয়া ভাবিত হইয়া পত্র দিয়াছেন। মন্মথ উঠিয়া মাকে একখানি পত্র লিখিল। আপনার অসুখের কোন কথা লিখিল না। কাজের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল, সে কারণে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আসল কথা ভাঁড়াইল। আরও লিখিল, "আবার আজই কাজের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে। চিন্তা করিও না। আশীর্ব্বাদ করিও যেন যে কাজে যাইতেছি তাহা সিদ্ধ হয়।" মন্মথ মার কাছে এই প্রথম মিথ্যা কথা কহিল।

শেষ রাত্রে যখন সবাই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, একাকী মন্মথ শয্যা হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে বাটীর বাহির হইল। কোথায় যাইবে তাহার নিরূপণ নাই, দুই পা যে দিকে লইয়া চলিল সেই দিকেই যাইতে লাগিল। একটু গিয়া বসিয়া পড়িল। আবার উঠিল, আবার বসিল। এইরূপ বসিতে বসিতে যাইতে লাগিল। তখনও তাহার শরীর বড় দুর্ব্বল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ"—এ কি সেই কুরুক্ষেত্র? কৃষ্ণার্জ্জুনের লীলাভূমি, ভীমের ক্রীড়াস্থল, ভীষ্মদ্রোণকৃপকর্ণের রণপ্রাঙ্গণ, একি সেই কুরুক্ষেত্র? কুরুপাণ্ডবের চির-কলহের শান্তি হইয়াছিল সে কি এইখানে? এই কি অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশভূমি? মহাভারতের সে কুরুক্ষেত্র কি এই কুরুক্ষেত্র? কে বলিবে? কে চিনাইয়া দিবে? পাণ্ডারা দ্বৈপায়ন হ্রদ দেখায়, ভীষ্মের শরশয্যাস্থল দেখায়, দ্রোণাচার্য্য যেখানে তাঁহার বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, অমানুষকীর্ত্তি ভীমসেন যেখানে দুঃশাসনের হৃৎপিণ্ড বিদারিত করিয়া তাহার রক্তে আপনার প্রতিহিংসার সন্তর্পণ করিয়াছিলেন, বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলিয়া যেখানে ঘিরিয়া বীরনামে চিরকলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, অর্জ্জুনের সম্মুখে যে স্থলে কর্ণের রথচক্র প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল,—আরও কত বিষয়, একে একে বলিতে বলিতে পাণ্ডারা সেই সব স্থানের খিন্ন স্মৃতিচিহ্ন সকল দেখাইতে থাকে। কিন্তু তাহা শুনি ও দেখি মাত্র, স্পষ্ট চিনিতে তো পারি না। আমি কোন্ মূঢ়, আজ যদি ভীষ্মদ্রোণের প্রেতাত্মা গভীর সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া এই স্থানে একবার বিচরণ করেন, তাঁহারাও ইহাকে তাঁহাদের সেই কুরুক্ষেত্র বলিয়া চিনিতে পারিবেন কি না জানি না। কালের হস্তে যত হউক না হউক, বিজাতীয়ের হস্তে আমাদের সকল তীর্থস্থানেরই প্রায় এই দশা ঘটিয়াছে!

এখনও যাহা আছে তাহা দেখিলে বাস্তবিক রোমাঞ্চ হয়, হৃদয়ে সত্রাস ভক্তির উদয় হয়। কেবল মাঠ—ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাঠ। আর সেই মাঠে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল পলাশ গাছ—ডালে

ডালে পাতায় পাতায় সমাকীর্ণ হইয়া ছাইয়া রহিয়াছে। আর যখন সেই সব গাছে ফুল ফুটে, কি অপূর্ব্ব শোভা! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ পুষ্পে সে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আলো হইয়া যায়। দূরস্থ পথিক সেই অনন্ত রক্তক্ষেত্র দেখিয়া শীহরিয়া উঠে, আজও কি সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর শোণিত-সাগর শুকায় নাই—তাহা ভাবিয়া ভয় পায়। কুরুক্ষেত্রে বিস্তর যাত্রী আসে। গয়াধামের ন্যায় হিন্দুরা এখানেও তাহাদিগের ঊর্দ্ধপুরুষের পিণ্ডদান করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহা মহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত।

এই কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরস্থ এক পলাশ-মূলে বসিয়া এক সন্ন্যাসী ও এক সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসীর বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে, গাত্রলোম পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে তার উপর ভস্মলেপ, কুঞ্চিত কপালে রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্রস্তবক, গলায় রুদ্রাক্ষ, পরণে গেরুয়া বাস। সে বয়সেও কান্তি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখিলে ভক্তি হয়, আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা যায়। তা, সন্ন্যাসীর বয়স এ আশ্রমের উপযোগী বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী এ আশ্রমের নিতান্তই অনুপযোগিনী। তাহার বয়স আজও ষোলর সীমা অতিক্রম করে নাই। অপূর্ব্ব শ্রী। সে সন্ন্যাসিনী আর কেহই নহে, তাহারই সুশ্রূষায় মন্মথ সে প্রাণান্তকর ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, সূর্য্য পশ্চিমের পলাশ-শ্রেণীর অন্তরালে ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ উভয়ে সেইখানে বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আমরা তাহার মাঝখান হইতে দুই একটা কথা শুনাইতেছি।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"মা, তখনও বলিয়াছিলাম এখনও বলি, এ বড় কঠোর ব্রত, তুমি বালিকা, তোমার ইহা কাজ নয়।"

সন্ন্যাসিনী। আজও কি পিতা, আমার উপর সন্দেহ আপনার গেল না!

"সন্দেহ করি না, এই বয়সে তোমার অসাধারণ ধৃতি দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু—

"তবে আবার কিন্তু কেন?

"কিন্তু মনে কর, আমি আর কত দিন? জীবন তো ফুরাইয়া আসিল। বড় পাপী বলিয়াই বিশ্বেশ্বর আজও চরণে স্থান দিতেছেন না, নহিলে আর বয়সের বাকি কি? কিন্তু বড় বেশী আর দেরিও নাই। তার পর আমি ম'লে তোমার উপায় কি হবে? তোমার এই বয়স, আর এই কুটিল সংসার, একেলা এ ব্রত কেমন করিয়া বজায় রাখিবে, মা?

সন্ন্যাসিনী শুনিয়া নিস্তব্ধ হইল। সত্যই ত! এ সকল কথা যে সে এত দিন একেবারে ভাবে নাই তাহা নহে; তবু হঠাৎ আজ শুনিবামাত্র আকুল হইয়া পড়িল। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তাই ত! কি বলিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। নির্ব্বাকে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

সন্ন্যাসীর চক্ষে এক বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল। বলিল—"কথা শুন, এ আশ্রম পরিত্যাগ কর।"

"ইহা ত্যাগ করিয়া কি করিব?"

"আবার গৃহী হও।"

"সে আশ্রম যে আমার বন্ধ।"

"তা তো সব জানি, পুরুষোত্তমের পথে যে দিন তোমার সহিত প্রথম দেখা সেই দিনই তো সব শুনিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, ভগবান্ তোমার একটা উপায় করিলেন, নিশ্চিন্ত হইলাম। তুমি

সুখে আছ ইহা ভাবিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সচ্ছন্দে মরিতে পারিব। বিধাতা সবই করিয়াছিলেন, আমার মন্দভাগ্য দোষে শেষ বিপরীত হইয়া উঠিল।”

এইখানে বলা উচিত, এ সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসী অপর কেহই নহে সেই লক্ষ্মী ও তাহার পালক পিতা।

লক্ষ্মী সেই রাত্রে কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না; প্রাণের ভিতর বড় কেমন করিতে লাগিল। কিন্তু পাছে স্বামীর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় সে জন্য কিছু বলিল না, চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তার পর যখন মন্মথ নিদ্রামগ্ন হইলেন তখন ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া বসিল। চাঁদের আলোয় একবার তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিল, অতি সাবধানে পা দুটী ধরিয়া কতই কাঁদিল, তারপর নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাটীর বাহির হইয়া একাকিনী নির্জ্জন পথ বাহিয়া চলিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পড়িল। তখনও প্রভাত হয় নাই। দেখিল, অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্র দল বাঁধিয়া চলিয়াছে, তাহারা শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিল। বালিকার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, একেলা কোথায় যাইবে তাহাই ভয়ে ভয়ে ভাবিতেছিল। সে তাহাদের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে চলিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার বড় অসুখ হইল। সঙ্গীরা ফেলিয়া পলাইল। মাঠের মাঝে বালিকা একেলা পড়িয়া রহিল। কাছ দিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছিল, কেহ ফিরিয়া চাহিল না। বড় কষ্টে অচেতন হইয়া পড়িল। কতক্ষণ সে অবস্থায় ছিল তাহা সে জানে না, কিন্তু চৈতন্য হইলে দেখিল যে, এক মহাপুরুষ কোলে লইয়া তাহার সুশ্রূষা করিতেছেন। সে সুশ্রূষার গুণে দুই দিনেই অসুখ সারিয়া গেল। অসুখ সামান্যই হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে

যত লোক অসুখে মরে তার অপেক্ষা ভয়ে চতুর্গুণ লোক মরিয়া থাকে। লক্ষ্মী চিনিল, সে মহাপুরুষ তাহারই পিতা। তখন পিতায় কন্যায় সব কথা হইল। পিতা কলিকাতার কোলাহল হইতে বাহির হইয়াই সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। রথযাত্রার তখন অল্প দিন বাকি ছিল; আগে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তাহা দর্শন করিয়া পরে কাশী যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কন্যার কথা শুনিয়া মনটায় বড়ই ক্ষোভ হইল। তখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা লইয়া অনেক পরামর্শ হইল। পর দিন লক্ষ্মী সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিল। পিতায় কন্যায় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে দিন তাহারা কুরুক্ষেত্র তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দুই দিন পরে এক দল বাঙ্গালী যাত্রী অম্বালা হইতে সেই থানে আসে। তাহাদের মুখে কথায় কথায় লক্ষ্মী শুনিল, মন্মথ নামে একজন বাঙ্গালী কলিকাতা হইতে অল্প দিন বদ্‌লি হইয়া অম্বালায় আসিয়াছে, তাহার বড় বসন্ত হইয়াছে, রক্ষা পাওয়া অসম্ভব—আহা! তাহার নাকি কেহই নাই! লক্ষ্মী শুনিয়া শিহরিল। এ কি তাহারি মন্মথ! তাহার মহাপ্রাণী কাঁদিয়া উঠিল। সে আর স্থির হইতে না পারিয়া পিতাকে আসিয়া বলিল। পিতাও চিন্তিত হইলেন। অম্বালা কুরুক্ষেত্রের কাছে। যাত্রীরা রাত্রেই ফিরিল। লক্ষ্মী পিতার অনুমতি লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনে চলিল। আজ চারি দিন হইল অম্বালা হইতে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধের পর সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—"আর একবার সংসারের কাজে ব্রত হইতে হইল দেখিতেছি। চল, মা, তোমায় লইয়া অম্বালায় যাই। মন্মথকে ভাল করিয়া সব বুঝাইয়া বলিয়া আসি।"

"তিনি তো এ পর্য্যন্ত কিছুই ভুল বুঝেন নাই।"

"তা নহিলে, আজ তোমার এ দশা কেন, মা?"

"এ দশা তিনি করেন নাই, আমি নিজেই করিয়াছি। বলিয়াছি তো, তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নাই, আমিই তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

"চল, আবার তাঁহার হাতে তোমাকে দিয়া আসি। মন্মথ তোমায় গ্রহণ করুন দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"না পিতঃ! তিনি তো আমাকে আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার কপাল মন্দ, তা তাঁর দোষ কি?"

"তবে কি করিবি, মা? তোর চিন্তা মনে হলে ঈশ্বর-চিন্তাও যে আর আমার ভাল লাগে না।"

সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ হইলেন, দুই বিন্দু অশ্রু কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাহা দেখিল। মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিল। হায় হায়! সে কি কেবল কাঁদিতে ও কাঁদাইতেই জন্মিয়াছিল? বিধাতা তাহার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যু লিখিলেন কেন? ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মী আবার পিতার প্রতি চাহিল। দেখিল, তখনও তিনি রোদন করিতেছেন। তখন, আপনার উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল—"চল সেই বাঙ্গালী যাত্রীটীকে দেখিয়া আসি। আহা কি কষ্ট! বৃদ্ধ শরীর, তায় বিদেশ, তার উপর এই দুরন্ত রোগ!"

তাহা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসীর যেন চমক ভাঙ্গিল। কি মনে হইল। বলিলেন—"চল।"

উভয়ে ধীরে ধীরে সে গাছতলা হইতে উঠিল। তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল। এখনও রৌদ্র উঠে নাই। প্রভাত বায়ু রহিয়া রহিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। ঘনপত্রবিন্যস্ত এক পলাশ-মূলে বসিয়া লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া এক বৃদ্ধ। দূরে বসিয়া লক্ষ্মীর পিতা ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছেন।

এই বৃদ্ধের কথাই পূর্ব্ব দিন লক্ষ্মী পিতাকে বলিয়াছিল। ইহার বিসূচিকা হইয়াছে। পাণ্ডারা আপনাদিগের ঘরে স্থান দিতে আর রাজি নহে। সঙ্গীরা বিস্তর জেদ করিল, কিছুতেই স্বীকার পায় না। সঙ্গীরাও ছাড়িবে না; শেষ পাণ্ডারা ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া রাখিল। সেখানে তাহাদেরই রাজত্ব, কে তাহাদের সঙ্গে হাঙ্গামা করিবে? বিশেষ সঙ্গীরা দেখিল, অবস্থা বড়ই খারাপ, তাহারা আর বড় উচ্চ বাচ্য করিল না। তাহাদের মধ্যে তাহার আপনার জন কেহই ছিল না। সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মী ও তাহার পিতা গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ একাকী বাহিরে পড়িয়া, কাছে কেহই নাই। তখন উভয়ে ধরাধরি করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে লইয়া আসিল। সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে ইহা দেখিল। কিন্তু কেহ চুঁ শব্দটী করিল না। কেবল সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া পরস্পরে একবার মুখচাওয়া-চাওয়ি করিয়া তাহার রূপের কথা আন্দোলন করিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি বেজায় ভেদ বমি হইল। বালিকা তাহা দুই হাতে কাটিতে লাগিল। মনে কিছুমাত্র বিকার নাই। সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই। সন্ন্যাসীও অনিদ্রা থাকিয়া অনেক সুশ্রূষা করিতে লাগিল। রাত্রি এক রকমে কাটিয়া গেল। ভোর বেলা রোগীর একটু তন্দ্রা আসিল। প্রভাতসমীর ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল, তাহার স্পর্শে

শরীর যেন অনেক সুস্থ হইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই আবার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আর একবার ভেদ হইল। বালিকা তাহা পরিষ্কার করিয়া আবার মাথাটী কোলে হইয়া বসিল। বৃদ্ধের তখন জ্ঞান হইয়াছিল, একবার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"তুমি কে, মা?"

"আপনার কন্যা।"

"আমার কন্যা!"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজাইল। সে চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। লক্ষ্মী আর কিছু বলিল না। ধীরে ধীরে পলাশ-পত্র লইয়া বীজন করিতে লাগিল।

দূর হইতে সন্ন্যাসী ইহা দেখিল। বৃদ্ধের চক্ষে জলবিন্দু পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করিল। আজ কয়দিন ধরিয়া সে লোকটাকে চেন চেন করিতেছে অথচ চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী সব দেখিল। মনের ভিতর অনেক কথা তোলাপাড়া হইতে লাগিল।

তিন দিন সেই গাছতলায় কাটিয়া গেল। তিন দিনের পর বৃদ্ধ আরোগ্য হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী পথ্য রাঁধিয়া দিল। বৃদ্ধ আহার করিল। তখন বলিকা তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিতে গেল।

বালিকা চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী বৃদ্ধের কাছে আসিয়া বসিল। বুড়া জিজ্ঞাসিল—"আপনি কে বাবা? এ মেয়েটী আপনার কে?"

স। আমি সন্ন্যাসী, এটী আমার কন্যা।

বৃ। সার্থক পিতা আপনি, অনেক পুণ্যফলে সাক্ষাৎ ভগবতী আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

স। কন্যাটী আমার ঔরসজাতা নহে, পালিতা।

বৃ। পালিতা!

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক হইল। বলিল—"কতদিন পালন করিতেছেন?"

স। দুই বৎসরের সময় ইহাকে পাইয়াছিলাম।

বৃ। দুই বৎসরের সময়!

আবার বৃদ্ধ মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। বলিল—"কে ইহাঁকে আপনার হাতে দিয়াছিল?"

স। ভগবান্ দিয়াছিলেন। কাশীতে ইহাকে আমি পাইয়াছিলাম।

বৃ। কাশী! কি বলিলেন—কাশীতে!

স। আজ্ঞে হাঁ। তা, আপনি অমন করিতেছেন কেন?

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস মর্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। সন্ন্যাসীর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। মনে মনে বলিল—"আহা, ভগবন্ তাই হউক।" প্রকাশ্যে বলিল—"আপনি কখন কি কাশী গিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ সে প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ক্ষণেক কিছু উত্তর দিতে পারিল না। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিল। তার পর দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিল।—"কাঁদিতেছেন কেন?"

এইবার বৃদ্ধ উত্তর করিল। বলিল—"কাঁদিতেছি কেন! তাহা কি বলিব? আজ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কাঁদিতেছি, তবু তো এ কান্না ফুরাইল না। যখনি সেই কথা মনে হয়, তখনি বুক যেন ফাটিয়া যায়। তুমি সন্ন্যাসী, তোমায় তাহা বলিয়া কি বুঝাইব? বিশ্বেশ্বর দয়াময় যে বলে, সে তাহা বলুক, কিন্তু তাঁহার মত নির্দ্দয় আমি আর কোন দেবতাকে জানি না। কাশীর নাম আর—"

বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"অমন কথা মুখে আনিতে নাই। তিনি চিরকালই দয়াময়; আমরা পাপী তাই তাঁহার দয়া সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

বৃদ্ধ রাগিয়া উঠিল। সে আচর-রোগমুক্ত ভগ্ন দেহ কোপে কাঁপিতে লাগিল। বলিল—"মাঝ-গঙ্গায় স্ত্রীপুত্র লইয়া অসহায় অবস্থায় নৌকা ডুবাইয়া মারাও কি তাঁহার দয়ার কাজ!"

সন্ন্যাসী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে হর্ষের উদয় হইল। তাহা চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"তিনি দয়াময়, আমাদের পাপের দণ্ড করিয়াও তিনি তাঁহার দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজও যে এ পৃথিবীতে পুণ্যের কিছু মাত্র আদর আছে সে কেবল পাপের দণ্ডের ভয়ে।"

বৃদ্ধ আরও রাগিল। বলিল—"কিন্তু দুই বৎসরের শিশু কি পাপ করিয়াছিল, যে তাহারও সেই দণ্ড ব্যবস্থা হইল।"

স। শিশুর নিষ্পাপ শরীর, তিনি তাহাকে অমন দণ্ড দেন না।

বৃ। দেন না! তবে আর বলিতেছি কি?

স। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ইহাতেও তাঁহার অসীম দয়ার প্রকাশ। শিশু পাছে পাপীর সংস্পর্শে থাকিয়া বিগ্‌ড়াইয়া যায়, এই জন্য কৌশলে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন মাত্র। শিশু মরে নাই।"

বৃদ্ধ বিস্ময়াবিস্ফারিত লোচনে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল। যেন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"আপনি কিসে জানিলেন শিশু মরে নাই?"

স। তাহার প্রমাণ, এই কন্যা।

"এই কন্যা!—এ কি আমার সেই হারাধন!" বৃদ্ধ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। চক্ষে জলধারা ছুটিল। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া স্বর্গারূঢ়া ব্রাহ্মণীর জন্য বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে ডাকিল—"ব্রাহ্মণি ব্রাহ্মণি! কোথায় তুমি, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও,

তোমার হারান রতন পাওয়া গিয়াছে!” ব্রাহ্মণের আর কথা ফুটিল না। বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

সুখ দুঃখের যুগপৎ প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে সন্ন্যাসী তখন ধীরে ধীরে পূর্ব্বকাহিনী সমস্ত বলিতে লাগিলেন। স্থির হইয়া বসিয়া ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা শুনিল। সন্ন্যাসীর কথা সমাপ্ত হইলে, তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তখন ভয়ানক। চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার অগ্রভাগে দুই বিন্দু অশ্রু ঝুলিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসে নাসাগ্রভাগ অবিরত স্ফীত হইতেছে, অধরপ্রান্ত দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছে—নীরব, নিঃস্পন্দ, নিশ্চল। জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায়, বিদারণোন্মুখ আগ্নেয় ভূধরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে স্তব্ধতা অতি ভীষণ। দেখিয়া সন্ন্যাসী শিহরিল। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ আপনার কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—“আমি বড় পাপী—বড় পাপী! অহো কি ঘৃণা! কি পরিতাপ! আমার জননীকে আমিনিজেই এত কষ্ট দিয়াছি! বিশ্বেশ্বর! ভালই করিয়াছিলে, ইহাকে এ পাপীর সংস্পর্শ হইতে পৃথক্ করিয়াছিলে; শেষ আবার তাহার পাপনিশ্বাসের নিকট ইহাকে কেন আনিলে ঠাকুর! মা আমার যথার্থই লক্ষ্মী। এমন মেয়েও কি হয়! ছি ছি ছি! আমিই তাহার যত দুঃখের মূল!”

সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। আর ব্রাহ্মণ বিলাপ করিতে করিতে কখন কপাল কখন বক্ষঃস্থল দুই হাত দিয়া চাপড়াইতে লাগিল।

এ ব্রাহ্মণ আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সেই ন্যায়সিদ্ধান্ত। ন্যায়সিদ্ধান্তই লক্ষ্মীর প্রকৃত পিতা।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিবিড় পলাশশ্রেণীর মধ্যে একখানি জীর্ণ কুটীর,—সেই কুটীরের ভিতর পত্রশয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী। আর মাথার কাছে সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধে বসিয়া সন্ন্যাসী ও ন্যায়সিদ্ধান্ত। লক্ষ্মী বিসূচিকা হইয়াছে। একদিনেই সে স্বর্ণলতা শুকাইয়া গিয়াছে। সেই ফুল্ল কমল বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তবুও সে আনন্দময়ীর মুখে হাসিখানি যেন এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী কাঁদিতেছেন, ন্যায়সিদ্ধান্ত কাঁদিতেছেন, বালিকা সে অবস্থায়ও সেই স্বভাবমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে তাহাদিগকে প্রবোধ দিতেছেন।

বেলা যখন তিনটা তখন অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। চোক বসিয়া গিয়াছে, মুখ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সোণার অঙ্গে নীল মাড়িয়া দিয়াছে। ক্ষীণকণ্ঠে লক্ষ্মী সন্ন্যাসীকে ডাকিল –"পিতা।''

সন্ন্যাসী বলিলেন—''কেন, মা ?"

ল। পায়ের ধুলা দাও, আর আমার বেশী দেরি নেই।

সন্ন্যাসী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী বলিল—"কাঁদিও না, বাবা কোথায় ?"

সি। এই যে মা, আমি তোমার কাছে।

ল। বাবা, বড় আক্ষেপ রহিল, এতদিনের পর দেখা পেয়েও একদিনও ভাল করিয়া সেবা করিতে পারিলাম না।

সি। আমারই সেবা করিয়াই তো মা তোমার আজ এ দশা। হায়, হায়, পাণ্ডারা যখন আমায় ফেলিয়া দিয়াছিল তখনই কেন আমি মরিলাম না ? কেন মা, এ হতভাগাকে বাঁচাইলে ? হায়, যতদূর কষ্ট দিবার তা দিয়া শেষ প্রাণেও মারিলাম !

সিদ্ধান্ত উন্মত্তের ন্যায় আপনার বুক চাপড়াইতে লাগিল। তাহার মনের ভাব তখন অতি ভয়ানক। মর্ম্মের পরতে পরতে শত-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা জ্বলিতেছে, মাথার উপর কে যেন তীব্র অঙ্কুশ আঘাত করিতেছে,—বড় জ্বালা,—বড় জ্বালা! সেই মৃত্যুমুখনিপতিতা বালিকার প্রতি যতই দেখিতেছে, ততই যেন সে জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। একে একে সব কথা মনে পড়িতেছে। সেই রামহরির আটচালায় সেই ভীষণ দলাদলির কথা। সে চক্রান্তের সেই যে একমাত্র মূল! সে তো বেশী দিনের কথা নয়। এখনও যেন সব চোখের উপর জাগিতেছে। অহো দলাদলির কি মোহ,কি মত্ততা! সিদ্ধান্ত মনে মনে বলিতে লাগিল—'হায় হায় কি করিয়াছি, দলাদলির মোহে অন্ধ হইয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি! হিংস্র পশুরাও আপনার শাবকদিগকে যত্নে রক্ষা করে, আমি নরাধম পিতা হইয়া কন্যাহত্যা করিয়াছি! তুষানলেও যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে করিতে সিদ্ধান্ত আপনার বুক চাপড়াইতে লাগিল। একজন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া সরাইয়া বসাইল।

তখন সূর্য্য ডুবিয়া আসিতেছিল, কিরণগুলা ছুটাছুটি করিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। দিগ্‌ভ্রান্ত একটা কিরণ লক্ষ্মীর মুখের উপর পড়িয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। যেন এ লক্ষ্মী তাহার সে লক্ষ্মী নয় মনে করিয়া কিরণ ত্রস্তে সে গৃহের বাহির হইবার পথ খুঁজিতেছিল। সহসা দরজায় কিসের শব্দ হইল। গৃহস্থিত সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, মন্মথ। শীর্ণকায় শুষ্কমুখ হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল, মন্মথ।

মন্মথকে দেখিবামাত্র সিদ্ধান্ত উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"আর কি দেখিতে আসিয়াছ, মন্মথ! মা আমার ছাড়িয়া যায়।"

মন্মথ! কথাটা লক্ষ্মীর কানে বাজিল। তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছিল; তবু সে সময়েও জোর করিয়া লক্ষ্মী একবার চোখ খুলিয়া চাহিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিঃস্পন্দ নির্ব্বাক্ হতবুদ্ধি মন্মথ-মূর্ত্তি। স্থির হইয়া বালিকা সে মূর্ত্তি দেখিল। একবিন্দু অশ্রু চোখের কোণে গড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আবার অধর প্রান্তে হাসির বিদ্যুল্লতা দেখা দিল। ধীরে ধীরে ধীরে সে হাসি মিলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

উন্মাদের ন্যায় বিকৃতকণ্ঠে মন্মথ ডাকিল—"লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—লক্ষ্মি!"

আর কোনও লক্ষ্মী সে ডাকের উত্তর দিল না।

সম্পূর্ণ।

মোহিনী।

The shadow of another cleaves to me,
And makes me one pollution.

. . . .

But help me, heaven, for surely I repent.

Tennyson.

মোহিনী।

১

আর আমি এ বুকের আগুন বুকে চাপিয়া রাখিতে পারি না। আমার এ কাহিনী শুনিয়া তোমরা আমাকে গালি দিবে—তা দাও। তাহাই এখন আমার কামনার জিনিষ। কর্ম্মদোষে গালিও আর এখন কেহ দেয় না। যাহারা বড় ভালবাসিত, বড় স্নেহ করিত, তাহারা আর এখন কেহ ফিরিয়াও চাহে না। তাহাদের কাছে গালির প্রত্যাশাও আর আমার নাই। কদাচিৎ পথে ঘাটে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। সে চলিয়া গেলে, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবি, ভাবিতে ভাবিতে কত কথাই মনে আসে, দুনয়নে জলধারা গড়াইয়া পড়ে—নরক-যাতনায় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। হে বিধাতা, নরকভোগই যদি আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলে, তবে একেবারে জীবনান্ত করিয়া কেন নরকে পাঠাইলে না? আমার অদৃষ্টে এ জীয়ন্তে নরক কেন লিখিলে?

কি বলিব, তোমরা কি বুঝিবে—এই মর্ম্মের পরতে পরতে জ্বলন্ত নিরয়বহ্নি অহর্নিশি ধূ ধূ জ্বলিতেছে—বড় যাতনা—বড় অসহ্য। এ আগুন নিভিবে না—নিভিবার নয় জানি, কিন্তু তবু যে মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও কাছে বসিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া একটু শান্ত করিব, তাহাও

অদৃষ্টে নাই। হায় রে, এই বহুজনসংকুল বিপুল পৃথিবী মাঝে এমন একটীও লোক পাই না, যাহার কাছে দুই দণ্ড এ দুঃখের কথা কহিয়া প্রাণের বোঝা কতকটা লাঘব করি?

পাপী ঘৃণার পাত্র সত্য, কিন্তু এমন একজনও মহাত্মা কি. নাই যে তাহাকে দয়ার পাত্র বিবেচনা করে? হায়, দয়া করিয়া তোমরা কেহ একবার এ হতভাগিনীর পাপকথায় কান দিবে.কি?

২

পাপ কথা! তা নহিলে, আর বলিতেছি কি? জানি না পূর্ব্বজন্মে কি একটু স্মুকৃতি করিয়াছিলাম যে, সেই বলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পিতা আমার বড় দেবভক্ত, নিষ্ঠাবান্ ও সাধুচরিত্র ছিলেন। নিত্য অতিথি-সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহারই আয়ে সংসার একরূপে নির্ব্বাহিত হইত। পিতা অন্য কিছু করিতেন না, দিনের অধিক সময় তাঁহার গৃহাধিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলার সেবা করিতে অতিবাহিত হইত; বাকি সময়টুকু শাস্ত্রালোচনায় ও সাংসারিক কর্য্যে কাটিয়া যাইত।

মা আমার পরম পতিব্রতা ছিলেন। একদিনও পিতার সমক্ষে তাঁহাকে একটীও উচ্চকথা কহিতে শুনি নাই। প্রত্যুষে উঠিয়াই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইতেন, আর রাত্রি দুই প্রহর বাজিয়া না গেলে তাঁহার বিশ্রামের অবসর হইত না। হয় ত ইহার মধ্যে কোন দিন শেষ বেলায় অতিথি কুটুম্ব আসিলে তাঁহার সে বেলার মত অর্দ্ধাশন বা অনশন ভিন্ন হইত না। দেব দ্বিজে অচলা ভক্তি, আত্মীয় স্বজনে অসীম দয়া, লোকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। পিতাকে পরম গুরুর ন্যায়

সেবা করিতেন। বুঝি গৃহবিগ্রহের অপেক্ষাও তাঁহাকে তিনি অধিক ভক্তি করিতেন। গ্রামের তাবৎ লোকেই তাঁহাকে সতীলক্ষ্মী বলিয়া ধন্য ধন্য করিত।

হায়, সেই সতীলক্ষ্মীর গর্ব্ভে জন্মিলাম কি না আমি! বিধাতা, তোমার এ কিরূপ বিচার? স্বর্ণতরুতে কেন এ পুরীষপূর্ণ মাকাল ফলের সৃষ্টি করিলে?

৩

কিন্তু জন্মিলাম তো মরিলাম না কেন? সূতিকা-গৃহেও তো অনেকের মৃত্যু হয়, আমার ভাগ্যে তাহাই কেন ঘটিল না? তা, আমি বলিলে কি হইবে?—বিধিলিপি অন্যরূপ! সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা না পোহাইয়া সূতিকা-গৃহে মাতৃক্রোড়ে শুইয়া মরণে যে সুখ, তাহা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমি না মরিয়া দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলাম।

অনেক দিন পূর্ব্বে একটী ছেলে হইয়া মারা গিয়াছিল, তার পর প্রায় আট দশ বৎসর কিছু হয় নাই। হবে না হবে না করিয়া শেষ অবস্থায় আমি হইলাম। আমার আদরের সীমা নাই। তায় বিধাতা রূপ দিয়া গড়িয়াছিলেন। সূতিকা-গৃহেই আমায় যে দেখিল, সেই মোহিত হইয়া গেল। সাধ করিয়া পিতা মাতা নাম রাখিলেন "মোহিনী"।

অতি শৈশবের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু যখন একটু বড় হইলাম, খেলিতে শিখিলাম, তখনকার অনেক কথা আবছায়া মত মনে পড়ে। মনে পড়ে, পিতার অবস্থা তত সচ্ছল না হইলেও, আমি অপরের দেখিয়া যখন যে খেলানার বাহানা লইয়াছি, তিনি তখনই তাহা

কিনিয়া দিয়াছেন। মা কত যত্নেই আমার ছোট ছোট 'জয়ের' পুতুল-গুলি পর্য্যন্ত এখানে ওখানে পড়িয়া থাকিলে কুড়াইয়া রাখিতেন। পাড়ায় খেলিতে গিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে তাঁহার মুখ খানি শুকা-ইয়া যাইত, সংসারের সব কাজ ছাড়িয়া তিনি পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা শুনিতে পাইলে সাধের পুঁথি ফেলিয়াই ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহারা দিবারাত্রি আমারই চিন্তা ও আমারই কথা লইয়া যাপন করিতেন। আমি যেন তাঁহাদের জীবনে একটা ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমি কি খাইতে ভালবাসি, কবে আমার ভাল খাওয়া হইল না, কোন্ কাপড় খানি পরিলে আমায় অতি সুন্দর দেখায়, কবে কি কথা কহিয়া তাঁহাদিগকে হাসাইয়া মারিয়াছিলাম, এত অল্প বয়সে আমি সে সব কথা শিখিলামই বা কেমন করিয়া—এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা লইয়াই তাঁহাদের দিন রাত্রির অধিক সময় অতিবাহিত হইত। কোন দিন আমার অসুখ করিলে, সে দিন পিতা যথাকালে নারায়ণসেবা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন; মা গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পাগলিনীর ন্যায় শিয়রে বসিয়া কেবল আমার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিতেন। আমি কতদিন ভাবিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই, তাঁহাদের মধ্যে কে আমায় অধিক স্নেহ করিতেন।

জানি না, প্রতিবেশীরাও এ হতভাগিনীকে কেন অত ভালবাসিত। দেখিতে পাই, পিতা মাতার খাতিরেই অনেকে অনেক ছেলেকে আদর যত্ন করে, পিতা মাতার সমক্ষেই অনেকে তাহাদিগকে কোলে লয় বটে, কিন্তু অসমক্ষে আবার তখনই নামাইয়া দেয়। আমার সম্বন্ধে কিন্তু তাহা একদিনও ঘটে নাই। যে কোলে লইত, সে আর নামাইতে চাহিত না। ক্ষুদ্র পল্লীতে বসতি অতি সামান্য—যাহার বাড়ী যে দিন না যাইতাম, পরদিন সে ছুটিয়া আমার সংবাদ লইতে আসিত। প্রাচীন

প্রাচীনারা আমায় লইয়া কত রঙ্গ করিতেন। আমার মুখে শ্লোক শুনিতে সবাই বড় ভাল বাসিত। সে শ্লোক বলিতে কত কথা ওলোটপালোট হইয়া যাইত—তাহাতেই তাহাদের মহা আনন্দ! শুনিতে শুনিতে হাসিয়া কুটোকুটি হইত। কদাচিৎ ধুলা বা পোকা পড়িয়া আমার চোখে জল দেখা দিলে, অমনি ব্যস্ত হইয়া কোলে লইয়া ভুলাইবার জন্য কত লোক কত চেষ্টা করিত—কেহ খেলানা দিত, কেহ মিঠাই দিত, কেহ অঞ্চল দিয়া যত্নে মুছাইয়া দিত, কেহ মুখে গণ্ডে কপোলে সস্নেহে চুম্বন করিত। আমি আবার না হাসিলে কোল হইতে নামাইত না।

তাই এখন সেই সব কথা মনে পড়ে আর কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবি, সেই আদরের এই খোয়ার!

৪

বছর যায় না জল যায়। দেখিতে দেখিতে আট বছরে পড়িলাম। পিতা আমাকে সেই বয়সে পাত্রস্থা করিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মাতা কিছুতেই তাহাতে সম্মতা হইলেন না। মার জেদে—আসল কথা আমার নির্ব্বন্ধবশতঃই—তাহা ঘটিল না। আমার নির্ব্বন্ধ বলিতেছি এই জন্য যে, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতাকে আর কখনও কোন বিষয়ে অন্যমত করিতে দেখি নাই। আমার নির্ব্বন্ধের দোষ দিই, কেন না, সেই কৈশোরেই পরিণীতা হইলে বোধ হয় আজ আর এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। যাহা হউক, পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন হইল না। আমি মাতার অঞ্চল ধরিয়া তেমনই খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ক্রমে আরও বড় হইলাম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপও বুঝি আরও

বাড়িতে লাগিল। ছাই রূপ! এ রূপ লইয়া পুরুষমহলে তখন কত ঘোঁটা-ঘুঁটি হইত জানি না, কেননা, তখন বড় একটা আর যে সে পুরুষের সামনে বাহির হইতাম না। কিন্তু মেয়ে মহলে সানের ঘাটের কমিটিতে নিত্য ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিত। কেহ বলিত—"কি রং—যেন দুধে আল্‌তা ফলাইয়া রাখিয়াছে।" কেহ বলিত—"চুল নয় ত যেন শ্যামাঠাকুরুণের কেশ!" কেহ বলিত—"কি গড়ন, যেন সর্ব্বাঙ্গে ননী পিছলাইয়া পড়িতেছে।" কেহ বলিত—"আবাগীর চোখ দেখেছ, যেন পটো তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে।" এইরূপ যাহার মনে যাহা আসিত, সে কত কথাই বলিত। ফলতঃ আমার মনে পড়ে, পায়ের নখ হইতে মাথার চুলগাছটির পর্য্যন্ত প্রশংসা করিতে কেহই ত্রুটী করিত না। শুনিয়া আমার মনে কি হইত, তাহা আমি বলিব না। কিন্তু মাতা মনে মনে বড়ই গর্ব্বিতা হইতেন। সেই সব কথা শুনিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহা আবার পিতাকে বলিতেন। শুনিয়া পিতারও আনন্দের সীমা রহিত না।

কিন্তু সে আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ক্রমে এই পোড়া-কপালীর ভাবনায় পিতা আকুল হইয়া উঠিলেন। একটী সুপাত্রের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন, আমি কাছ ছাড়া হইলে বা ঘুমাইয়া পড়িলেই পিতা মাতা উভয়ে বসিয়া ঐ কথারই আলোচনা করিতেন। তাঁহারা দুই জনে ঐ কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যদি কোথা হইতে আমি সেইখানে আসিয়া পড়িতাম, তাহা হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। আমার সে ভাব দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিতেন, জানি না; কিন্তু মনে যাহাই করুন, আমাকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাদের চিন্তা যেন আরও বাড়িয়া উঠিত। বস্তুতঃ চিন্তার বিষয় বটে। শাস্ত্র-মতে আমি তখন অরক্ষণীয়া। একাদশে পড়িয়াছিলাম।

৫

আমাদের মেটেঘর। সন্ধ্যার সময় উত্তরের ঘরের দাবায় বসিয়া শলিতা পাকাইতেছিলাম—এখন আমি সংসারের কাজ কর্ম্মে যথাসাধ্য মার সহায়তা করিতাম—মা জল আনিতে গিয়াছিলেন। পিতাও গৃহে ছিলেন না। বাড়ীতে আমি একা। শলিতা পাকাইতে পাকাইতে বোধ হয় গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা অচিরশ্রুত গোবিন্দ অধিকারীর গানও গাহিতেছিলাম। হঠাৎ মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখি, বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া কে এক অপরিচিত যুবক বাহিরের দরজা ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। আমি চমকিয়া উঠিলাম। স্পষ্ট চোখো-চোখি হইল। পলক না ফিরাইতে সে ব্যক্তি উঠানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"অতিথি।"

জন্মিয়া অবধি এ ভিটায় বিস্তর অতিথি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অতিথি ত দেখি নাই। কে জানে কেন সহসা আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া, সে মৃদু মন্দ হাসিতে হাসিতে আবার বলিল, "বাটীর কর্ত্তা কোথায়?" উত্তর দিব কি, আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। বসিয়া ছিলাম, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলাম না। মাকে গিয়া যে সংবাদ দিব, তাহাও আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। নীরবে পুতুলের ন্যায় কেবল সেই এক স্থানে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম।

আমার দশা দেখিয়া বুঝি তাঁহার দয়া হইল। একবার আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"কাহাকেও দিয়া বাহিরে এক খানা আসন পাঠাইয়া দিবেন। আর কোথাও গিয়া বাসা লইতে পারিতাম; কিন্তু অতিথি সৎকার না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে পাছে আপনার পিতা আপনার প্রতি রুষ্ট হন, তাই অন্য কোথাও গেলাম না।"

কথাগুলা কানে বাজিল। এ মৃদু ভৎ´সনায় কতকটা চৈতন্যও হইল। দাঁড়াইয়া ভাবিলাম—তাই ত, করিলাম কি? পরম অতিথি-ভক্তের কন্যা হইয়া অতিথির অবমাননা করিলাম? পিতা শুনিলে কি বলিবেন? চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে জল লইয়া মা গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাকে সব বলিলাম। ভয় হইয়াছিল, না জানি কতই ভৎ´সনা করিবেন। কিন্তু মা বেশী কিছু না বলিয়া, কেবল বলিলেন—"ছি মা, কাজ ভাল কর নাই।"

তখন, তাড়াতাড়ি জলের কলস রক্ষা করিয়া মা এক খানি আসন লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে বিছাইয়া দিয়া আসিলেন। সেই অবসরে আমি একটী প্রদীপ জ্বালিয়া সেইখানে দিয়া আসিলাম। দেখিলাম, পিতা আসিয়াছেন, অঙ্গনে দাঁড়াইয়া অতিথির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। হয় ত আমার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে—চুপ করিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। ও হরি! এ অতিথি বলে কি! সে পিতার নিকট আমার কত প্রশংসা করিয়া বলিতেছে, সে তাঁহার দেখা না পাইয়া অন্যত্র যাইতেছিল, আমিই নাকি কত বলিয়া কহিয়া যাইতে দিই নাই! শুনিয়া পিতা বড় হৃষ্ট হইলেন। আমি কিন্তু না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। মুখে কাপড় দিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলাম।

৬

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। রাত্রিতে বিশেষ আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। একবার মাত্র সেই অতিথির সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। সে সেই মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে মোহন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল, আমি যদিও তখন ভাল করিয়া দেখি নাই, কিন্তু পরে কপাটের আড়াল

হইতে দেখিয়াছিলাম। কার্ত্তিকের ন্যায় রূপ—অতি সুললিত গঠন। যেমন মুখশ্রী, তেমনি নাক চোক কপাল ভুরু। মাথার উপর তেমনি কাকপক্ষসদৃশ সুচিক্কণ ও নিবিড়কৃষ্ণ কেশদাম। সর্ব্বাপেক্ষা কি সুন্দর সেই চাহনি ও হাসিখানি। একাদশ বৎসর বয়স—বালিকা বল, কিশোরী বল—যাহাই বল,—আমি সে রূপ দেখিয়া মজিলাম।

সে রাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, অতিথি তখনও চলিয়া যান নাই। পিতার সহিত কি একটা কথা লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। অতিথি এক ছড়া বহুমূল্য হার পিতার হাতে দিয়া তাহা আমার জন্য গ্রহণ করিতে বারবার অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু পিতা কিছুতেই স্বীকৃত হইতেছেন না। শেষ অতিথিরই জয় হইল। পিতা হার ছড়া হাতে করিয়া বাটীর ভিতর আসিলেন। আমি উঠানেই দাঁড়াইয়া ছিলাম, পিতা আসিয়া আমার হাতে দিলেন। ছেলেবেলা হইতেই আমার একটা কদর্য্য রোগ ছিল। আমি গহনা পরিতে ও বেশভূষা করিতে বড় ভালবাসিতাম। ইতস্ততঃ না করিয়া সেই রত্নহার কণ্ঠে ধারণ করিলাম। অকস্মাৎ সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলাম, দুয়ারের ফাঁক দিয়া অতিথি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আমি বুঝিলাম, সে দৃষ্টির অর্থ কি। এ সব কথা বুঝিতে আমরা মেয়েরা বিলক্ষণ পটু। পঁচিশ বৎসরের পুরুষ যাহা না বুঝে, দশ বৎসরের বালিকা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। বুঝিলাম, সে দৃষ্টির অর্থ—তিনি বলিতেছেন, "কেমন, আমার হার হৃদয়ে ধারণ করিলে?" আমি—হায় সেই দণ্ডে কেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল না—আমি ঈষৎ ঘাড় নত করিলাম। হাসিতে হাসিতে অতিথি বিদায় হইলেন।

৭

বেলা তৃতীয় প্রহর। আহারান্তে ঘরের ভিতর শুইয়া আছি,—আধ ঘুমন্ত—আধ জাগন্ত অবস্থা—এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক মাথায় মোট লইয়া, "মাঠাকুরুণ কোথায় গো!" বলিয়া ডাকিল। মা রান্নাঘরে ঠাকুরের বৈকালির জন্য নারিকেলসন্দেশ তৈয়ার করিতেছিলেন, বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"কে গা?"

স্ত্রীলোকটী আধাবয়সী,—দাবায় মোট নামাইয়া বলিল,—"অনেক দূর হইতে আসিতেছি মা, এই জিনিষ গুলি ঘরে তোল।"

মা জিজ্ঞাসিলেন—"কোথা হইতে আসিতেছ, বাছা?"

যে আসিয়াছিল সে বলিল—"গোবিন্দপুরের নীলরতন বাবুর বাড়ী হইতে আসিতেছি। এই সব সামগ্রী তিনি আপনাদের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

গোবিন্দপুরের নীলরতন বাবু একজন দেশবিখ্যাত লোক। সে অঞ্চলে ছেড়ে বুড়া মেয়ে পুরুষ সকলেই তাঁহার নাম জানিত। বিস্তৃত জমিদারী, অগাধ ধন দৌলত, প্রভূত মানসম্ভ্রম। হঠাৎ তিনি এত লোক থাকিতে এই দুঃখী ব্রাহ্মণপরিবারের প্রতি এরূপ কৃপাবান্ হইলেন কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

স্ত্রীলোকটী অতি চতুরা, মাতার বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া বলিল,—"বাবুর মেজ ছেলে এক দিন পথে রাত্রি হওয়ায় আপনাদের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি গিয়া আপনাদের কত সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাই বাবু এই সব সামগ্রী পাঠাইয়াছেন।" শুনিয়া মা আরও বিস্মিতা হইলেন।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি বাহিরে আসিলাম। আমাকে

দেখিবামাত্র সেই স্ত্রীলোক চিত্রার্পিতের ন্যায় বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ সে ভাব সাম্‌লাইয়া বলিল—"এস, দিদিঠাক্‌রুণ!"

আমাকে দেখিয়া মা তাহাকে মুখ হাত ধুইবার জল দিতে বলিলেন। কলসী হইতে জল গড়াইতে গেলাম। সে আমার জল না লইয়া ঘাট দেখাইয়া দিতে বলিল। খিড়কীতে সচরাচর সরিবার মত একটী ছোট ডোবা ছিল। আমি তাহাকে সেই দিকে লইয়া গেলাম। বাহিরে আসিয়া সে আমার পানে চাহিয়া বলিল,—"এমনি করিয়াই কি একটা লোককে মারিতে হয়, দিদি?" কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমি অবাক্ হইয়া তাহার প্রতি চাহিলাম।

সে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া একটু কাছে ঘেঁসিয়া বলিতে লাগিল—"সত্য কথা শোন। আমি নীলরতন বাবুর নিকট হইতে আসি নাই। তাঁহার মেজ ছেলে সতীশ বাবু আমায় পাঠাইয়াছেন। তুমি তাঁহার হার গলায় পরিয়াছ, ইহাতে তিনি চরিতার্থ হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহার বদলে একছড়া শুষ্ক মালাও তো দিলে না! আহা তিনি পাগলের ন্যায় হইয়া গিয়াছেন। এমন যে কাঁচা সোণার ন্যায় রং তাহা এই কয় দিনেই যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। আতি কাতরে আমা দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এই চেন-হার ছড়াটি—(সে কাপড়ের ভিতর হইতে এক গাছি সুন্দর নক্ষত্রখচিতের ন্যায় চেন-হার বাহির করিয়া দেখাইল)—যদি তুমি একবার গলায় দিয়া তার পর তাঁহাকে পরিতে দাও, তাহা হইলে তিনি এ জীবন রাখিবেন; নহিলে হারের বদলে ফাঁসি গলায় দিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবেন।"

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মনের আবেগে তখন তাহাকে কি বলিলাম, সব কথা মনে নাই। তবে সে স্ত্রীলোককে তাঁহার সম্বন্ধে

অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইলাম, তিনি নাকি অতিথি সাজিয়া যে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাহা ভাণমাত্র। আমার কথা, আমার রূপের প্রশংসা শুনিয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিয়ৎ কালের জন্য একটীও কথা কহিতে পারিলাম না। সেই চতুরা স্ত্রীলোকটী তখন এদিক্ ওদিক্ লক্ষ্য করিয়া সহসা সেই চেনহার ছড়া আমার গলায় পরাইয়া দিল! জানি না, তখন আমাতে আমি ছিলাম কি না। যেন কলের পুতুল কলে কাজ করিতেছিলাম। ধীরে ধীরে গলা হইতে সেই হার খুলিয়া সেই স্ত্রীলোকের হাতে দিলাম। সে তাহা লইয়া অঞ্চলে বন্ধন করিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে মার আওয়াজ পাইয়া হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। ছি ছি ছি—কি করিলাম, মালা বদল করিলাম! হায় হায় অগ্র পশ্চাৎ কিছুই ভাবিলাম না--চিরকালের জন্য মজিলাম! মাথা ঘুরিতে লাগিল—সেই স্ত্রীলোকের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকে তদবস্থা দেখিয়া সে হিড় হিড় করিয়া বাড়ীর ভিতর টানিয়া আনিল। তার পর, জলটল খাইয়া খানিক বাজে গল্প করিয়া বেলা পড়িলে সে মাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। সেই দিন অবধি আমি হৃদয়ের শান্তি হারাইলাম।

৮

বৈশাখ মাস। বিবাহের মাস। তায় অনেক দিন ধরিয়া অকাল—এবার বিবাহের আর সংখ্যা নাই। আমাদের সামান্য গ্রাম, তাই মাস পড়িতে না পড়িতে বাজনা ব্যাণ্ডে ও শাঁখের আওয়াজে তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ার ভিতরই কত বর আসিল, কত

বাসর জাগিলাম। আমার সঙ্গীদের মধ্যেই পাঁচ ছয় জনের বিবাহ হইয়া গেল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া পিতা মাতা আমার বিবাহের জন্য আরও অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষ, একাদশ উত্তীর্ণ হয়—যোড়া বৎসর পড়ে—তায় যে বাড়ন্ত গড়ন, দেখিলেই লোকে শিহরিয়া উঠে। পিতা নানা স্থানে সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে সেই স্ত্রীলোক কখন ভাল কাপড়, কখন ভাল খাদ্যদ্রব্য লইয়া আরও অনেকবার আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল। বলিতে কি, একদিন সতীশচন্দ্র নিজেই আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মাতার ইচ্ছা ছিল—জানি না, তিনি গোপনে আমাদের অন্তরের কোন ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না—সতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ দেন। পিতা কিন্তু কিছুতেই রাজি হইলেন না। বড় জেদাজেদির পর একদিন রাগিয়া মাকে বলিলেন—"তোমার কথায় মেয়েকে এত বড় করিয়া রাখিয়া শেষ এত কষ্ট পাইতেছি, তা বলিয়া অ-ঘরে কখনই দিতে পারিব না।" পিতার রাগ দেখিয়া মা আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না। আমি অকূল সমুদ্র দেখিতে লাগিলাম।

সাধিলেই সিদ্ধি। খুঁজিতে খুঁজিতে একটী পাত্র মিলিল। বড় নাকি সুন্দর চেহারা, শান্ত স্বভাব, নির্ম্মল চরিত্র, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, সৎকুলসম্ভূত। পাত্র দেখা হইয়া গেল, তৎপক্ষীয়েরা আমায় দেখিতে আসিল। পাড়ার কত লোক আসিয়া আমায় সাজাইয়া দিল। এক জন আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, আমায় বলি দিতে লইয়া যাইতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে আমি কনে দেখা দিতে গেলাম। সেই দেখাতেই পাকা দেখা হইয়া গেল। দিন স্থির হইল। আড়ষ্ট হইয়া আমি শুনিলাম, সপ্তাহ পরে বিবাহ।

৯

বিধাতার কি চক্রান্ত বলিতে পারি না—পক্ষাধিক হইল, গোবিন্দপুর হইতে কোন সংবাদ পাই নাই। সে স্ত্রীলোক কি সতীশচন্দ্র কেহই আসে নাই—এ সংবাদ তাহারা কিছুই জানিত না। আমি ব্যাকুল-চিত্তে নিত্য পথ চাহিতে লাগিলাম। এক দুই করিয়া দিন যাইতে লাগিল—কেহই আসিল না। হাজার হউক বালিকা—কি করিব, করিবার ক্ষমতাই বা কি? লুকাইয়া লুকাইয়া কতই কাঁদিলাম। কিন্তু সে অরণ্যরোদনে কোনও ফল দর্শিল না। আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, কতকগুলি এয়ো আসিয়া আমার গায়ে খানিকটা হলুদ মাখাইয়া দিল। সে দিন বাড়ীতে মহাসমারোহ হইল। সাজিয়া গুজিয়া অনেকের সঙ্গে বসিয়া আয়ুবড় ভাত খাইলাম। হায়, তাহার অপেক্ষা বিষ খাইতে পাইলে বুঝি অধিক তৃপ্তি পাইতাম। এক একবার বড় কান্না পাইতে লাগিল। এক একবার মার পা জড়াইয়া সব কথা বলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু ফুটিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। মনে মনে ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। বিধাতা আমোদ দেখিতে লাগিলেন।

মাঝে একটা দিন—তাহাও কাটিল। গোবিন্দপুর হইতে কেহই আসিল না। রাত্রি না পোহাইতে আত্মীয় কুটুম্ব ও লোকজনে বাড়ী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাহিরে রোসনচৌকির দল সুর ধরিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিল। বড় বড় খোলা জ্বালিয়া হালুইকরেরা মাথায় গামছা বাঁধিয়া লুচি ভাজিতে বসিল। গ্রামের চাঁই মহাশয়েরা আসিয়া মুরুব্বিয়ানা ও ঘন ঘন তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। ছেলের দল সেই যে ভোরে আসিয়া আড্ডা দিয়াছে, আর বাড়ী ছাড়িতে চাহে

না। গ্রামের যত কুকুর সব জড় হইয়া খিড়কি অধিকার করিয়া বিষম রব করিতেছে। তা ছাড়া, কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ পান সাজিতেছে, কেহ গহনাপরা হাতখানা ঘন ঘন নাড়িতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ গান মুখস্থ করিতেছে, কেহ বা অনর্থক গোল করিয়া সঙ্গিনীদের মাথা ধরাইয়া দিতেছে। উৎসবের সীমা নাই।

সবাই আনন্দ করিতেছে, আর যাহাকে লইয়া আনন্দ, সেই আমি কেবল নবমীর উৎসবে যূপবদ্ধ ছাগশিশুর ন্যায় অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছি। আর সামলাইতে না পারিয়া আমি একবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। দৌড়িয়া আসিয়া মা আমায় কোলে তুলিয়া লইলেন। উপবাসে এরূপ হইয়াছে, ইহাই সকলে অনুমান করিল। একবাটী দুধ ও সন্দেশ আনিয়া মা আমার মুখের কাছে ধরিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমি আপনা হইতে সামলাইয়া বসিলাম। কোন ভয় নাই বলিয়া মাকে প্রবোধ দিলাম, কিন্তু দহ্যমান হৃদয়কে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলাম না।

দুঃখিনীর দুঃখে উপহাস করিয়া সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। আমার শেষ আশাটুকু পর্য্যন্ত ফুরাইল। সন্ধ্যা না হইতেই আমাদের ক্ষুদ্র বাড়ীখানি আলোময় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বেহারাদের হুম্ হাম্ শব্দের সহিত বর আসিয়া পৌঁছিলেন। বড় জোরে রোসনচৌকি বাজিয়া উঠিল। উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে বাড়ী ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মেয়েরা বর দেখিতে ছুটিল। দুই একজন সঙ্গিনী বর দেখিবার জন্য আমায় টানিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি দেখি নাই। তার পর, শুভদৃষ্টির সময় ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম কি না, তাহাও ঠিক মনে নাই। কিন্তু মনে আছে, যতক্ষণ আমি তাঁহার নিকট ছিলাম,

ততক্ষণ এক দণ্ডের জন্যও হৃদ্‌কম্প যায় নাই। মন্ত্রগুলাও সব পড়িয়াছিলাম কি না—অথবা কি পড়িতে কি পড়িয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। তা, সে যাই হউক, আসল কাজ বাকি থাকিল না। সম্প্রদান শেষ হইয়া গেল।

আমি মনে মনে একজনের হইয়া বাহিরে আর একজনের হইলাম।

১০

বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী আসিলাম। শ্বশুর শ্বাশুড়ী ছিলেন না; থাকিবার মধ্যে দূর সম্পর্কের এক ননদ। তা, পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া খুব আনুগত্য করিল। এ সব কাজে বড় একটা কাহাকেও খুঁজিতে হয় না; বিপদের সময় যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পাওয়া যায় না, সম্পৎকালে তিনি আপনা হইতেই আসিয়া যুটেন। দুইটীমাত্র একতালা কুঠারি, তাহারই একটীতে উঠিয়া আমরা কড়ি খেলিলাম। ধূমধামের সহিত—আমার স্বামীর অবস্থায় যতদূর ধূমধাম হওয়া সম্ভব, তাহার অতিরিক্ত মাত্রায়ও—বৌভাত, ফুলশয্যা প্রভৃতি হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর সহিত প্রথম কথা কহিলাম। আমি তো কিছুতেই মুখ তুলিব না, কিন্তু তিনিও ছাড়িবার পাত্র নন—ঘোমটা খুলিয়া দিয়া, হাত কাড়াকাড়ি করিয়া, ছলে বলে আমায় কথা কহাইলেন। আমার মনের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তিনিও ছাড়েন না; কাজেই কি করি, পাঁচ কথায় চুপ করিয়া থাকিয়া একবার জবাব দিতে হইল। তিনি যেরূপ স্নেহ-মাথান আগ্রহের স্বরে আমায় নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহা যদি তখন আমার বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে বস্তুতঃ বুঝিতে পারিতাম, সেই এক দিনেই তিনি আমার রূপে মুগ্ধ

হইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমি পোড়াকপালী, তাহা বুঝিব কি, তাঁহার প্রত্যেক কথায় যার পর নাই জ্বালাতন হইতেছিলাম। যে দুই একটা কথার উত্তর দিতেছিলাম, তাহাও নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে দিতেছিলাম। তিনি বলিলেন—"দেখ, দরিদ্র বলিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইত, সে কষ্ট আর নাই। সাতরাজার ধন তোমাকে আমি পাইয়াছি। কিন্তু ভাবিতেছি, এই ক্ষুদ্র কুটীরে তোমায় রক্ষা করিব কি করিয়া?"

আমি আবাগী বলিলাম—"বোধ হয়, রাখিতে পারিবে না।"

উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তার পর বলিলেন, "তুমি বালিকা, তোমার কথার অর্থ তুমি বুঝ না। কিন্তু দেখ, এ পৃথিবীতে আমাকে আমার বলিতে আর কেহ নাই। বড় আশায় তোমায় লইয়া সংসার পাতিতেছি। কলিজার রক্ত অপেক্ষাও তোমাকে আমি যত্নে রাখিব। তুমি আমায় ভাল বাসিবে কি?"

অশুভক্ষণে আমার মুখ হইতে আপনা-আপনি বাহির হইল—"না।" উত্তর শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। হঠাৎ কথাটা বাহির হইয়া গেলে, আমারও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছিল, গৃহালোক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ক্ষীণালোকে দেখিলাম, তাঁহার মুখশ্রী কেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু মেলিয়া আড়ষ্ট ভাবে অর্থশূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি আর দেখিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে চক্ষু নত করিলাম।

১১

আট দিন পরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলাম। কে জানে কেন স্বামী 'যোড়ে' গেলেন না। এক মাস পর্য্যন্ত আর স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলাম

না। এক মাস পরে হঠাৎ এক দিন পিতার পৃষ্ঠব্রণ হইল। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বহুমূত্র ছিল। তায় বয়স হইয়াছিল—সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইলেন না। মায়ে ঝিয়ে আমরা অকূল পাথারে ভাসিলাম।

পিতার অসুখ শুনিয়া স্বামী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ক্রমে অসুখের বৃদ্ধি দেখিয়া আর ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। এখন তিনি আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যথাকালে শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। আমার বিবাহে কিছু দেনা হইয়াছিল, সুতরাং বেশী কিছু ঘটা হইল না। বিষয়াদির বন্দোবস্ত ও সংসারের ব্যবস্থা করিতে স্বামীকে অনেক দিন থাকিতে হইল। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে যাত্রা স্বামীসহবাস অনেক দিন ধরিয়া হইল।

স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্র দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিত। শুনিয়া মাতার বড় আনন্দ হইত। তায় তিনি সদা হাস্যময়, হৃদয় স্নেহের পারাবার তুল্য। সেই স্নেহের গুণে দিনে দিনে একটু একটু করিয়া আমিও তাঁহার পক্ষপাতী হইতে লাগিলাম। বায়ুর নিকট মেঘের ন্যায় ক্রমে সেই পূর্ব্বভাব আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বলিতে পারি না, সতীশ ও স্বামী উভয়েই উপস্থিত থাকিলে আমি এমন হইতে পারিতাম কি না। কিন্তু সতীশের কোনও সংবাদ নাই, আর স্বামী আসিয়া নিত্য অপার স্নেহরাশি ঢালিয়া দিতেছেন, হৃদয় ক্রমে ক্রমে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইবে, তাহা বিচিত্র কি?

তায় পতিব্রতাকুলেশ্বরী মা নিত্য প্রাতঃসন্ধ্যায় পতিসেবা ও পতিভক্তির অশেষবিধ উপদেশ দিতেন। সেই নীতিপূর্ণ উপদেশ শুনিতে শুনিতে অনেক সময় আমি তন্ময় হইয়া পড়িতাম—আপনার অবস্থা ভুলিয়া যইতাম—পতির সেবায় মন দিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইতাম।

সে চেষ্টায় আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইতাম, বলিতে পারি না। কিন্তু গুরুর মহিমায় চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে আমি হৃদয়ে অনেকটা শান্তি ফিরিয়া পাইলাম।

১২

বিধাতার কিন্তু ইহা সহ্য হইল না। তাঁহার সৃষ্টির কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা ভাবিয়া মূল ধরিয়া টান দিলেন। সেই শান্তিপ্রদায়িনী জননীকে আমি হারাইতে বসিলাম।

মা. পিতার শোক কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। দিনে দিনে ক্রমেই মলিন ও শীর্ণ হইতে লাগিলেন। একবেলা আহার, তাহাও কেবল বসিতেন মাত্র। বলিলে বলিতেন, রুচি নাই। আমাদের লইয়া তিনি সংসারে মন বাঁধিতেন বটে, কিন্তু তবু সদাই যেন তাঁহার কি মনে পড়িত. ব্যাকুলনেত্রে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেন—একটা নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যাইত—নিঃশব্দে আবার গৃহকার্য্যে প্রবৃত্তা হইতেন। নিত্য ইষ্টদেবতার আরাধনা সাঙ্গ হইলে, দেখিতাম, পিতার খড়ম দুখানি সচন্দন পুষ্পে পূজা করিয়া কখনও মস্তকে, কখনও বা বক্ষে ধারণ করিতেন, আর দু নয়নে অবিরলগতি জলধারা গড়াইয়া পড়িত। পতিব্রতা পতি ছাড়িয়া কয় দিন থাকিবেন? তিন মাস না যাইতেই অকস্মাৎ একদিন কি একটু মাথার অসুখ হইল, তিনি তুলসীতলায় শুইয়া ইষ্টনাম জপিতে জপিতে পতিপাশে চলিয়া গেলেন।

আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। স্বামী আমায় কতই প্রবোধ দিলেন। তার পর, মাতৃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, ঘরে চাবি দিয়া, তিনি আমাকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন। ইচ্ছা করিয়াই আমি গেলাম।

পিতা মাতা হারাইয়া, আর সে ভিটায় এক দণ্ডও বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। স্বামী আমাকে যারপরনাই যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম স্নেহে ক্রমে পিতা মাতাকেও ভুলিতে শিখিলাম। যে ননদের কথা বলিয়াছি, তিনি বরাবরই সংসারে থাকিতেন—তিনিও আমাকে খুব আদর অবেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুখে স্বামীর ঘর করিতে লাগিলাম।

আমার সুখ হইল বটে, কিন্তু সহসা স্বামীর এক ঘোরতর অসুখের কারণ উপস্থিত হইল। লোকে বলে—স্ত্রীভাগ্যে ধন। তা, আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী—আমার দৃষ্টিতে রাজার ভাণ্ডার পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইবার কথা, তা যৎকিঞ্চিৎ অর্থের কথা তো সামান্য। তিনি কলিকাতায় একটী আপিসে ৬০ টাকা বেতনে চাকুরি করিতেন। বিবাহের সময় হইতেই কামাই চলিতেছে। সাহেব আর ছুটী দিতে বা বদলি লইতে রাজি নহে। একদিন হঠাৎ ডাকে একখানি চিঠি আসিল—সাহেব তাঁহাকে জবাব দিয়াছে, তাঁহার স্থলে অন্য লোক ভর্ত্তি করিয়াছে। বিমর্ষ মুখে চিঠিখানি লইয়া স্বামী বাড়ীর ভিতর আসিলেন। কষ্টের সহিত তাঁহার বিপদের কথা শুনাইলেন। ননদ ঠাক্‌রুণ—"ওমা তাই ত, কি হবে? কি ক'রে সংসার চলিবে?" বলিয়া কান্না ধরিলেন, শেষ সাহেবের উদ্দেশে অজস্র গালি পাড়িতে লাগিলেন।

স্বামীর ম্লান মুখ দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। তাঁহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বলিলাম,—"তা ভাবনা কি? বাবার বিষয় তো আছে এতদিন তাহাতেই তো আমাদের চলিতেছিল, এখনও তাহাতেই চলিবে।"

আমার কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইয়া, স্বামী আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তত কষ্টেও তাঁহার মুখে হাসি দেখিলাম। ঈষৎ হাস্য

করিয়া, তিনি আমার অধরপ্রান্তে একটী টোকা মারিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

১৩

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তেমন সুখের বৎসর আর আমার জীবনে কখনও কাটে নাই। ক্রমে আমি সংসারের অনেক কাজ শিখিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম বাটনা বাটা, কুটনা কোটা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, পান সাজা, বিছানা করা—এ সব কাজ আমি নিজেই আমার উপর বরাদ্দ করিয়াছিলাম। তার পর একবেলা করিয়া রাঁধিতে আরম্ভ করিলাম। কোনও দিন হয় ত ভাত ধরাইয়া ফেলিলাম, কোনও দিন ডালে আদৌ নুন দিতে ভুলিয়া গেলাম, কোনও দিন বা এক ব্যঞ্জন ঝালে পোড়াইলাম, আমি অপ্রতিভ হইয়া মরিতাম—কিন্তু স্বামী কোনও কথা কহিতেন না—হাসিতে হাসিতে তাহা দিয়াই খুঁটিয়া ভাত খাইতেন। অবসর পাইলে স্বামীর কাছে, একটু একটু করিয়া পড়িতেও শিখিতে লাগিলাম। বড় সুখে আমার এক বৎসর কাটিল।

পর বৎসর দুর্ব্বৎসর পড়িল। সময়ে ভাল বৃষ্টি হইল না। অনেক চাষার বুনন পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। নাবাল জমিতে যাহার কিছু হইল, তাহা আবার কার্ত্তিকে ভরণায় ডুবিয়া গেল। জল আষাঢ় শ্রাবণে হয় নাই বটে, কিন্তু জল আকাশ-পোরা ছিল। কার্ত্তিকের শেষে অতিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। চাষারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিয়া পড়িল। পাকা ধান সকল জলে ডুবিয়া হাজিয়া পচিয়া মরিয়া যাইতে লাগিল। সেবার আমার পৈতৃক জমি হইতে একটীও ফসল আদায় হইল না। অথচ, সেই জমির ধান ভিন্ন সংসার চলিবার অন্য উপায় নাই। স্বামী বিশেষ

ভাবনাপন্ন হইয়া পড়িলেন। আরও ভাবনার কারণ, আমি তখন সাত মাস অন্তঃস্বত্ত্বা।

১৪

একদিন—তখন উপর্য্যুপরি তিন দিন ধার করিয়া চলিয়াছে, আর দেনা করিতে স্বামী অনিচ্ছুক—একদিন বৈকালে আমায় কাছে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—"দেখ, মোহিনী, আর তুমি ছেলেমানুষটি নও, সংসারের অবস্থা সমস্তই বুঝিতে পারিতেছ। আর বসিয়া থাকিলে চলে না—বিশেষ সম্মুখেই সূতিকাগৃহের বিস্তর খরচ—আমি একটী কাজের যোগাড় করিয়াছি। যদিও তাহাতে তেমন পয়সা নাই, তবু বসিয়া না থাকিয়া তাহাই করিব স্থির করিয়াছি। তোমার পরামর্শ কি?"

আমি আর পরামর্শ দিব কি, এতদিন পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া একা থাকিতে হইবে, ইহা শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম,—"তা, প্রতি বৎসরই কি ভগবান্ এমনই করিবেন? এবার অজন্মা হইয়াছে, এবার না হয় আমার গহনাগুলি বিক্রয় কিরিয়া সংসার চালাও।"

স্বামী জানিতেন, আমি অলঙ্কার কত ভালবাসি। বলিলেন—"ছিঃ! ও কথা মুখে আনিও না। এই যুবা বয়সে ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গহনা বেচিয়া খাইব? কাল দিন ভাল, কালই আমি চাকুরি করিতে যাইব।"

"কাল!"—স্তম্ভিত হইয়া আমি তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"প্রতি শনিবার বাড়ী আসিব সে জন্য ভাবনা কি? আর বেশী দূর নয়, এই কাছে—গোবিন্দপুরে নীলরতন বাবুর বাড়ী—আবশ্যক বুঝিলেই তখনই সংবাদ দিতে পারিবে।"

"গোবিন্দপুর--নীলরতন বাবু—" ছাঁৎ করিয়া প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল; হঠাৎ আমি কেমন হইয়া গেলাম।

স্বামী বলিলেন—"তুমি তাঁহাদের চেন নাকি?—নীলরতন বাবুর ছোট ছেলেকে পড়াইবার জন্য একটী মাষ্টার দরকার। আমি সেই কাজ করিব।"

বিন্দু বিন্দু করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। একটীও কথা বলিতে পারিলাম না। কথা কহিবার শক্তি তখন আমার ছিল না।

১৫

শনিবার শনিবার স্বামী বাড়ী আসেন। রবিবার থাকিয়া আবার সোমবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই চলিয়া যান। যখনই তিনি বাড়ী আসেন, তখনই নীলরতন বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সুখ্যাতি তাঁহার মুখে ধরে না। তাঁহারা তাঁহাকে কত ভাল বাসেন, কত যত্ন করেন, নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন—মহাহর্ষে স্বামী সেই সব গল্প করিতে থাকেন, আর আমি তাহা শুনিতে শুনিতে অন্তরে কাঁপিয়া মরি।

এক মাস যায় যায়—হঠাৎ এক শুক্রবার বৈকালে দেখি যে, স্বামী একখানি পত্র দিয়া একটী লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। পত্র আমার নামে আসিয়াছিল—আমি নূতন পড়িতে শিখিতেছিলাম—তাহা খুব বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরেই লিখিত হইয়াছিল, বানান করিয়া করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পত্রখানি পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ! যাহার ভয়ে সারা হইতেছিলাম, এ যে তাহাই! স্বামী লিখিয়াছেন—'সোমবারে এখানে আসিয়া দেখি, বাবুর মেজ ছেলে বাড়ী আসিয়াছেন। কি

সুন্দর রূপ! শান্ত, সুশীল ও মিষ্টভাষী, আজ কয়দিন মাত্র আলাপ হইয়াছে, ইহাতেই তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল বাসেন। আমি তাঁহার অমায়িকতাগুণে মুগ্ধ হইয়াছি। দেড় বৎসর তিনি দেশে ছিলেন না—কানপুরে তাঁহার পিতার এক কল আছে, সেইখানে থাকিয়া তাহা দেখেন শুনেন। তবে লোকে অন্য কথা কয়—বলে, তাঁহার স্বভাব অতিশয় খারাপ হওয়ায় তাঁহার বাপ তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন—আমি কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি না। সে যাহা হউক, তোমার সহিত তাঁহার দেখাশুনা হইল কেমন করিয়া? তোমার পিতা মাতার জন্য কত দুঃখ করেন, নিত্য আমার মুখে তোমার কথা শুনিতে ভাল বাসেন, মাঝে মাঝে কত সুখ্যাতি করেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি একবার এখন তুমি কেমন গৃহিণী সাজিয়া ঘরকন্না করিতেছ তাহা দেখিবেন। তাই কিছু খরচ দিয়া এই লোক পাঠাইলাম। কাল তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমি যাইব। বড়লোকের ছেলে—যেন আহারাদি বিষয়ে কষ্ট না হয়।"—

আরও অনেক কথা লেখা ছিল—আমি কেমন আছি, গর্ভস্থ শিশু কেমন আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ;—কিন্তু সে সব পড়িতে আর আমার শক্তি ছিল না। আমার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল, জিভ আমূল শুকাইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল—চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

লোক বিদায় হইয়া গেল। আমি 'বড় অসুখ করিতেছে' বলিয়া বিছানায় গিয়া শুইলাম। গায়ে যেন বিছার কামড় জ্বলিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক লহমার জন্যও চক্ষু বুজিল না। শয্যাকণ্টকের ন্যায় বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম।

১৬

পরদিবস সন্ধ্যার সময় স্বামী গৃহে আসিলেন। তখনও আমি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম। আমাকে অন্য দিনের ন্যায় দ্বারদেশে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে অনেক সামগ্রী ছিল, সেইগুলা মেজের উপর ঢালিয়া আমার শিয়রে আসিয়া বসিলেন। আমার তখন বেশ সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু তবু কে জানে মাথার ভিতর কি গোলমাল হইয়া গেল—লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম,—"কে—কে তুমি—সতীশ?"

স্বামী বলিলেন—"না, আমি; সতীশ বাবু বাহিরে আছেন।"

আমি কিছু না বলিয়া একবার কট্‌মট্‌ করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম। আমার রকম দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। এই সময়ে ঠাকুরঝি সেই গৃহে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি মাথায় কাপড় দিতেও ভুলিয়া গেলাম। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে স্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—"এ কি! হঠাৎ এ কি সর্ব্বনাশ!"

ঠাকুরঝি ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন—"কি জানি? কাল হইতে এইরূপ হইয়াছে। ছেলেমানুষ বলিলে শুনে না, সকাল সন্ধ্যা নাই, গার মাথার কাপড় খুলিয়া থাকে—নিশ্চয়ই কোনও 'উপরি'র দৃষ্টি হইয়াছে। তা, ভয় নাই—একটু জল পড়িয়া দিলে ও রূপো চাঁড়ালকে ডাকিয়া ঝাড়াইলেই সারিয়া যাইবে।"

স্বামীর আর হাত-পা ধোয়া হইল না। তিনি সতীশকে ভিতরে ডাকিয়া হাত মুখ ধুইবার জল দিয়া, সংক্ষেপে বিপদের কথা জানাইলেন। তার পর, বিস্তর অনুরোধ করিয়া সতীশকে জল খাইতে বসাইয়া, আপনি সেই ধূলাপায়েই রূপো চাঁড়ালকে ডাকিতে গেলেন।

তখনও স্বামী ফিরিয়া আসেন নাই, ঠাকুরঝি রান্নাঘরে রান্নাবান্না লইয়া ব্যস্ত আছেন, জলযোগান্তে সতীশ একবার আমার দরজায় আসিয়া উঁকি মারিল। আমি তখন সেই দিকেই চাহিয়াছিলাম—পরস্পর চোখোচোখি হইল। চীৎকার ছাড়িয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

চীৎকার শুনিয়া 'কি কি' করিতে করিতে ঠাকুরঝি দৌড়িয়া আসিলেন। চোরের ন্যায় সতীশ সরিয়া গেল। আচম্‌কা লাফাইয়া উঠিতে আমার উদরে বড় বেদনা লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম।

১৭

কতক্ষণ পরে স্বামী ওঝা লইয়া ফিরিলেন। সে কত ঝাড় ফুঁক করিল, কত ঘটি ঘটি জল গিলাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উদরের বেদনায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলাম।

যেখানকার অন্নব্যঞ্জন, সেইখানে পড়িয়া রহিল। অনাহারে সকলের সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটিয়া গেল। কাটা কবুতরের ন্যায় যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে ভোর বেলা এক মৃতবৎ সন্তান প্রসব করিলাম।

ঠাকুরঝির শাঁখের আওয়াজে বুঝিলাম, হতভাগিনীর গর্ভে এক হতভাগ্যের জন্ম হইয়াছে। তার পর কি হইল আর কিছুই বুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। ধীরে ধীরে সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া জ্ঞানরহিত হইয়া পড়িলাম।

কত দিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম, জানি না; কিন্তু যে দিবস চৈতন্য হইল, চাহিয়া দেখি, গৃহে অগ্নি জ্বলিতেছে, পার্শ্বে বসিয়া স্বামী আমার শুশ্রূষা করিতেছেন, আর অদূরে দাইয়ের কোলে সায়াহ্নকমল-

তুল্য একটী ক্ষুদ্র শিশু শুইয়া রহিয়াছে। মায়ার কি মোহিনীশক্তি, শিশুর প্রতি চাহিবামাত্র মুহূর্ত্তের জন্য যেন আমার সকল কষ্ট দূরে গেল। ধাত্রীর নিকট হাত পাতিয়া শিশুটীকে চাহিলাম। সে আমার আগ্রহ দেখিয়া তাহাকে আমার হস্তে দিল। অতি যত্নে দুই হাতে সাপটিয়া বুকের উপর রক্ষা করিলাম। সেই ক্ষুদ্র শিশু কি যাদু জানিত জানি না, ধীরে ধীরে আমার সর্ব্ব শরীরে যেন মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিল। শিশুকে বুকে করিয়া, তাহার মুখে স্তন দিয়া নিমেষের মধ্যে আমি সকল জ্বালা ভুলিয়া গেলাম।

সেই দিন বৈকালে ডাক্তার আসিয়া—ডাক্তার নিত্য দুইবেলা আসিতেছিলেন—বলিয়া গেলেন, আর তাঁহাকে আসিতে হইবে না, ঔষধ খাওয়াইবার আর প্রয়োজন নাই, ঈশ্বরকৃপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।

১৮

দেখিতে দেখিতে আমি বেশ সারিয়া উঠিলাম। স্বামীর আহ্লাদের সীমা নাই। দেখাদেখি ঠাকুরঝিরও আনন্দ ধরে না। ক্রমে শিশুর ষষ্ঠীপূজা হইয়া গেল। আমি আঁতুড় হইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়া দেখিলাম, যে মাঝে মাঝে প্রায়ই ভারে ভারে দ্রব্যাদি আসিয়া থাকে। তাহা কোথা হইতে আসে, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এক দিন ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুরঝি বলিলেন—"আর কোথা হইতে আসিবে, দিদি? এ সব জিনিষপত্র সেই সতীশবাবু পাঠাইয়া দেন। এত নিষেধ করি, কিছুতেই শুনেন না। আহা অমন গুণের ছেলে আর দেখি নাই। তোমায় যে আবার ফিরিয়া পাইয়াছি, সে কেবল তাঁহারই অনুগ্রহে।"

কাছে বসিয়া স্বামী তাহা শুনিতেছিলেন, বলিলেন—"তা আর একবার বলিতে? সতীশের ঋণ আমি কিছুতেই শোধ দিতে পারিব না। এত খরচপত্র করিয়া, এই বিপদ ঠেলিয়া উঠা কি আমাদের কাজ? নিরুপায়ের ভগবানই উপায় করিয়া দেন। নহিলে সে কেন আমার জন্য এত করিবে? সতীশ আমার কে?"

আবার সেই সতীশ—সতীশ—সতীশ! সে যে কেন এত করিতেছে, তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম সে আঠাকাটি দিয়া আমায় ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। কি জানি বিধাতার মনে কি আছে! আমি অন্তরে শিহরিয়া উঠিলাম।

এক মাস গত হইয়া আরও কয়েক দিন গিয়াছে, হঠাৎ স্বামী এক দিন বৈকালে নীলরতন বাবুর নামাঙ্কিত একখানি পত্র আনিয়া আমায় পড়িতে দিলেন। নীলরতন বাবু স্বামীকে লিখিতেছেন,—"এইমাত্র কানপুর হইতে সংবাদ পাইলাম, সেখানকার দুই জন সরকার তহবিল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে। কত টাকা গিয়াছে, তাহার হিসাব হয় নাই। উমাচরণ (বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) পীড়িত, সতীশ ছেলে মানুষ, তাহার উপর ততটা নির্ভর করিতে পারি না; অতএব কল্যই মেলট্রেণে তোমাকে সেখানে যাইতে হইবে। ঈশ্বরেচ্ছায়, এখন তোমার বাড়ীর সংবাদ অনেক ভাল, অতএব প্রাতেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে অন্যথা করিবে না।"

পত্র পড়িবামাত্র, কি এক অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া বলিলাম—"তার পর?"

স্বামী বলিলেন,—"তার পর আর কি? প্রত্যূষেই রওনা হইব। এমন মনিবের কথা কি অবহেলা করিতে পারি? বিশেষ হিসাব দেখা—ভরসা করি, সপ্তাহের বেশী বিলম্ব হইবে না।"

রাত্রি না পোহাইতেই স্বামী সসজ্জ হইয়া বিদায় মাগিলেন। হায় আমি অভাগী কেন যাইতে দিলাম—কেন ধরিয়া রাখিলাম না? অগ্রে শিশুর মুখে একটী চুম্বন করিয়া, আমার অধরে একটী চুম্বন করিলেন। সে চুম্বনের কথা মনে হইলে এখনও আমি পাগল হইয়া যাই—এখনও তাহার উষ্ণতা অধরে অনুভব করি—হায় সেই চুম্বন তাঁহার শেষ চুম্বন!

১৯

সপ্তাহ কাটিয়া গেল—কেবল দুইখানি চিঠি পাইলাম—স্বামী আসিলেন না। শেষ পত্রে বুঝিলাম, তাঁহার আসিতে এখনও বিস্তর বিলম্ব হইবে। শিশুটি অকালে হইয়াছিল—বড় কৃশ দুর্ব্বল হইয়াছিল। অমন যে রং, তাহাও কেমন ফ্যাঁকাশে হইয়াছিল। অসুখ একদিনও ছাড়া ছিল না। আমি তাহাকে লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

একদিন সতীশ আমাদিগকে দেখিতে আসিল। সে একেবারে বাড়ীর ভিতর আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। আমি তখন আদুড় গায়ে পুত্রকে স্তন দিতেছিলাম। তাহাকে দেখিবামাত্র গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া বসিলাম। আমার দিকে চাহিয়া সে ঈষৎ হাস্য করিল। সেই সর্ব্বনেশে হাসি! শিহরিয়া আমি ছুতা করিয়া ঘরের ভিতর উঠিয়া গেলাম।

তার পর হইতে সতীশ বড় ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহার সহিত ঠাকুরঝির বড় ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ হইল। সন্দেহ হইবার কারণ, একদিন ঠাকুরঝি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁ গা, বৌ, ও তোর কিঁ রকম আক্কেল? সতীশ তোর দেওরের মত। তা, দেওরের সঙ্গে কথা কহায় দোষ কি?" আমি বুঝিলাম,

ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বলিতে কি সম্প্রতি তাহাকে ঘন ঘন দেখিতে দেখিতে, আবার ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। বুঝি আর সামলাইতে পারিলাম না। ঘরে গিয়া উর্দ্ধমুখে যুক্তকরে সজলনয়নে মাঝে মাঝে ভগবানকে কতই ডাকিতাম—'হে দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এ দুর্ব্বলকে বল দাও, এই আশ্রয়-হীনের সহায় হও।' আমি হতভাগিনী—হতভাগিনীর প্রার্থনায় বিধাতা কর্ণপাত করিলেন না।

২০

একদিন গ্রীষ্মকালে দুই প্রহরের সময় শিশুটীকে লইয়া ঘরের মেঝেয় আলুথালু অবস্থায় শুইয়া ঘুমাইতেছিলাম—নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখি, পার্শ্বে বসিয়া সতীশ ধীরে ধীরে আমায় বীজন করিতেছে। ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। নির্লজ্জ সতীশ আমার হাত ধরিল। সেই স্পর্শে আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। সর্ব্ব শরীর কেমন করিতে লাগিল, একটীও কথা কহিতে পারিলাম না। হাতের ভিতর হাতখানি ঘামিতে লাগিল।

সতীশ তাহার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া গললগ্ন সেই চেন হার দেখাইল। বলা বাহুল্য, অনেক দিন হইতে আমি তাহার প্রদত্ত সেই হারছড়া খুলিয়া রাখিয়াছিলাম। সে বলিল—"কতদিন আমার দেখিতে সাধ হইয়াছে, সে হার তোমার গলায় আছে কি না। তুমি তাহা অনায়াসে খুলিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু চাহিয়া দেখ, আমি তাহা তেমনিই যত্নে কণ্ঠে রাখিয়াছি; চিতা শয্যায় না শুইলে ইহা কখনই কণ্ঠচ্যুত হইবে না।"

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। নিষ্ঠুর সতীশ

বলিতে লাগিল—"বিধাতার বিড়ম্বনা, তোমার বিবাহের সময় আমি দেশে ছিলাম না, নহিলে এ বিবাহ হইতে দিতাম না। কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাইবার নয়। যাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমার সহিত একেবারে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করা তোমার উচিত নয়।"

দুর্ব্বল চিত্ত তখন বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তখন চেতন কি অচেতন ছিলাম, কিছুই মনে করিতে পারি না। বুঝি, চোখ দিয়া আরও জল পড়িয়া ছিল; বুঝি, মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; সহসা আমার পতনোন্মুখ দেহ সতীশ দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। মাথাটা ঘুরিয়া গিয়া তাহার বুকের উপর পড়িল।

আমি আমার সর্ব্বস্ব ধন হারাইলাম।

২১

সতীশ ক্রমে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। সে আর বাড়ী যাইতে চাহে না। দিন নাই রাত্রি নাই, আমাদের বাড়ীতেই পড়িয়া থাকে। ঠাকুরঝির আদর যত্নের সীমা নাই। সতীশ যে তাঁহাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

কখন কখন আমার বড় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। ঘরে দোর দিয়া মাথা কুটিতাম, গালে মুখে চাপড়াইতাম; কাঁদিয়া মেঝে ভাসাইয়া দিতাম। সে সময় সতীশের নাম করিলে রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। আবার কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাকে না দেখিলে প্রাণের ভিতর কেমন ছট্‌ফটানি ধরিত। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া সে আত্মগ্লানিও কমিয়া আসিতে লাগিল।

পূর্ব্বের ন্যায় তখনও মাঝে মাঝে স্বামীর পত্র আসিত—পত্র আমার নামে আসিত, আমি কিন্তু আর তাহা পড়িতে সাহস করিতাম না। পত্রের নাম শুনিলেই কেমন বুক গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। শিশু কাঁদিয়া সারা হইলেও আর তাহাকে কোলে লইতে পারিতাম না। তাহার পানে চাহিতেও যেন কি আতঙ্কে আমার শরীর শুকাইয়া যাইত। মস্তকে ক্ষত হইলে কুক্কুরী যেমন কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, আমিও তেমনি কি করিব কিছুই ঠিকানা পাইতাম না।

এদিকে ক্রমশঃ লোকে কাণাঘুষা আরম্ভ করিল। এক দিন আড়ে আড়ে তুই একজন বেশ ঘা দিয়া দু কথা শুনাইয়া দিল। পাড়ার ছেলের দল সতীশকে একদিন অন্ধকার রাত্রে ঠেঙ্গাইবে বলিয়া পরামর্শ আঁটিল। গতিক দেখিয়া সতীশ আমাকে বলিল,—"সব তো শুনিতেছ, আর এরূপে থাকা অসম্ভব। চল, অন্যত্র চলিয়া যাই।"

প্রথমে আমি রাজি হইলাম না। তুই একদিন বলিতে বলিতে ইতঃস্তত করিলাম। শেষ মত দিলাম।

গোপনে গোপনে সব ঠিক্ করিয়া সে দিন শেষ রাত্রে আমরা উঠিলাম। পুত্রকে ফেলিয়া যাইব, ইহাই স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু যাইবার সময় একবার তাহার মুখখানি না দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। সতীশ গহনার বাক্স লইয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া—আমি চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিতে করিতে ঘুমন্ত পুত্রের মুখখানি চুম্বন করিতে যাইব, এমন সময় শিশু কাঁদিয়া উঠিল। ভয়ে আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম। ভয়ের কারণ, পাছে ননদিনী জাগিয়া উঠেন। তিনি আমাদের এ পলায়নের কথা জানিতেন না। তিনি সহস্র সতীশের পক্ষ অবলম্বন করুন, ইহা জানিতে পারিলে কখনই

আমরা পলাইতে পারিতাম না। সতীশও সেই ভয়ে আমার হাত ধরিয়া টানিল।

নিঃশব্দে অন্ধকারে অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

২২

ছয় মাস হইবে কলিকাতায় আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একটী ছোট খাট অথচ দিব্য পরিষ্কার দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া আমরা বাস করিতেছি। কলিকাতা সহর—কে কাহার সংবাদ রাখে?—তবু ছাদে উঠিয়া যাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে, তাহারা আমাদিগকে পতি-পত্নী বলিয়া জানিয়াছে। সতীশ আমাকে বড় আদরে রাখিয়াছে। মুখের কথাটী না খসিতেই সে আমার ইচ্ছা পালনে প্রাণপণ করিতেছে। দুই জন মিশনারি স্ত্রীলোক আসিয়া নিত্য আমাকে লেখা পড়া ও পিয়ানো বাজান শিক্ষা দেন। অল্প দিনের মধ্যে আমি বেশ পিয়ানো বাজাইতে শিখিলাম। যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া সতীশ শিক্ষয়িত্রীকে বিদায় দিল।

কলিকাতায় আসিয়া আমি কত কি দেখিলাম। গঙ্গারপুল, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, চিড়িয়াখানা, আজবঘর, পরেশনাথের মন্দির—আরও কত নূতন নূতন স্থান দেখিলাম। শনিবার হইলে প্রায়ই আমরা থিয়েটারে যাইতাম। কোন দিন যাইতে না চাহিলে সতীশ আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইত। সারকেশ, ঘোড়দৌড়, মেমের নাচ, ব্রাহ্মসমাজ—কিছুই দেখাইতে সতীশ ত্রুটী করিল না।

বলিতে লজ্জা করে—সে কত দিন আপনি সাহেব সাজিয়া আমাকে মেম সাজাইত। প্রথম আমি তো কিছুতেই রাজি হইব না, সেও

ছাড়িবে না—জোর করিয়া আমায় মেমের পোষাক পরাইয়া দিয়া, হিড় হিড় করিয়া টানিয়া একখানা দাঁড়া-আরসির সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল—"দেখ দেখি কেমন মানাইয়াছে।"

আমি কালামুখী সেই আরসিতে আপনার রূপ আপনি দেখিলাম। দেখিয়া হাসি আসিল। সতীশ নিজহস্তে আমার মুখে পাউডার মাখাইয়া দিয়া, তার পর নেকলেস, ব্রুচ, ব্রেসলেট প্রভৃতি বিবিয়ানা গহনা পরাইয়া দিল। এইরূপ বেশ আমাদের মাঝে মাঝে হইত, মাঝে মাঝে আমরা এই বেশে বগি করিয়া ইডেন গার্ডেন ও গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতাম।

নিত্য নূতন পোষাক, নিত্য নূতন গহনা, বস্তাবন্দী কাপড়, কার্ব্বা-ভরা আতর গোলাপ, ডজন ডজন সাবান ও এসেন্স—আমার জন্য সতীশ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিল। আমি নিষেধ করিলেও শুনিত না; ঈষৎ হাসিয়া বলিত—'ইহাতেই যদি আমি তৃপ্তি পাই তবে তুমি বাধা দাও কেন?'

আমি আর কিছু বলিতাম না। অনেক সময় ভাবিতাম সতীশ নিত্য এত অর্থ পায় কোথায় হইতে। কিন্তু ভাবিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তবে দেখিতাম, খরচের অভাব হইলে মাঝে মাঝে সে বাড়ী যাইত, আবার দুই দিন না যাইতেই প্রচুর অর্থ লইয়া ফিরিয়া আসিত।

২৩

এক দিন পাঁচটা বাজিয়াছে—আফিস হইতে লোকজন বাসায় ফিরিতেছে—সতীশ দুই দিন হইল টাকার জন্য বাড়ী গিয়াছে—একেলা প্রাণটা বড় উড়ু উড়ু করিতেছিল—জানালার ধারে বসিয়া আমি

পিয়ানো বাজাইয়া একটী গান গাহিতেছিলাম—হঠাৎ পিয়ানো কেমন বেস্থরো বলিল, গান অন্তরার এক চরণ না গাহিতেই কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। অকস্মাৎ আমাদের সিঁড়ির উপর দুপ্ দুপ্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সতীশ ছুটিয়া আসিতেছে, আর তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ভীমাকার দুই জন পুলিষের লোক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আমি সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমাকে দেখিয়া, সেই পুলিষের লোকেরা বলিল—"আপনি কি এই বদ্‌মায়েসের স্ত্রী? আপনি গৃহে যাউন, আমরা ইহাকে ধরিয়া লইয়া যাইব।"

লজ্জার মাথা খাইয়া আমি বলিলাম—"ইনি কি করিয়াছেন, তোমরা ইহাঁকে ধরিবে কি জন্য?"

তাহারা বলিল—"এ চোর। প্রায়ই মাঝে মাঝে বেশ্যালয়ে গিয়া, তাহাদিগকে মদের সহিত মরফিয়া খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে। এতদিন অনেক চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারি নাই। কাল রাত্রে সোণাগাছিতে ঐরূপ এক বেশ্যালয়ে চুরি করিয়াছে—আমরা—"

সতীশ রুখিয়া উঠিল। বলিল—"অত কথায় তোদের কাজ কি? আমি ধরা পড়িয়াছি, আমায় থানায় লইয়া চল্।"

আমার নিকট তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় সে বোধ হয় লজ্জা পাইয়াছিল। যাহা হউক, আর আমার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। চোখের উপর হইতে এক খানা মেঘ যেন সরিয়া গেল। এত দিন বহু চিন্তা করিয়াও যাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, তাহা এক

নিমেষে পরিষ্কার হইয়া গেল। সতীশের অত লম্বাই চওড়াই কিসে হইত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। মুখ আঠা পিটিতে লাগিল, আর একটীও কথা বাহির হইল না। সর্ব্বশরীর কেমন করিতে লাগিল। প্রাণের উপর বড় ধিক্কার জন্মিল ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে রোষে ফুলিতে ফুলিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

বাহিরে দরজার কাছে বিস্তর লোক জমা হইয়াছিল। সতীশকে ধরিয়া যখন বাহিরে লইয়া গেল, তখন বড় একটা গোল উঠিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া সে গোলমাল চলিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া আমি একবার রাস্তার ধারের খড়খড়ি টানিয়া নীচের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সতীশের দুই হাত বাঁধিয়া পুলিষের লোকেরা টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে ঘুষা ঘাষা, গুতাটা গাতাটা যে দিতেছিল না তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে আগু পিছু বিস্তর লোক ছুটিতেছে—কেহ গালি দিতেছে, কেহ মারিতে যাইতেছে, কেহ পূর্ব্ব হইতেই তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছে। অধোমুখে মাটীর সহিত দৃষ্টি মিশাইয়া সতীশ চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। বিকল-হৃদয়ে উদাসনেত্রে ইতস্ততঃ চাহিয়া আছি—এমন সময়ে দূরে রাস্তার অপর পারে গ্যাসের স্তম্ভে হেলান দিয়া—শীর্ণদেহ, শূন্যদৃষ্টি, মলিন-বসন, রুক্ষকেশ, উন্মাদাকার ছন্নমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া—ও কে ও? মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে করিতে চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। জোর করিয়া আবার চাহিলাম।—সেই—সেই—সেই!

মূর্চ্ছিতা হইয়া আমি সেইখানে পড়িয়া গেলাম।

২৪

যখন চৈতন্য হইল, তখন রাত্রি চম্ চম্ করিতেছে। সে কোলাহল, সে লোকের সাড়া শব্দ থামিয়া গিয়াছে। স্তব্ধ নিশীথের কি এক অনির্ব্বচনীয় বিরাট গম্ভীরতা চারি দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কদাচিৎ দুই এক খানা শকটের ঘড় ঘড় শব্দ, পাহারাওয়ালার মস্ মস্ শব্দ ও নিশাবিহারী দুই এক জন বাবুর বিকট হাস্য শ্রুত হইতেছে। তদ্ভিন্ন সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত। ধীরে ধীরে উঠিলাম। তখনও খড়খড়ির পাখি খোলা ছিল। একবার সেই রাস্তার দিকে চাহিলাম—বিস্তৃত রাজপথ পথিকপরিত্যক্ত হইয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। অপর পারে সারি সারি সারি গ্যাসালোক জ্বলিতেছে, দুই এক জন লোকও যে দেখা যাইতেছিল না, তাহা নহে। কিন্তু যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া দেখিলাম। কোথাও সেই প্রাণসর্ব্বস্বের দর্শন পাইলাম না।

অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার মেজের উপর বসিয়া পড়িলাম। প্রাণের ভিতর যে ভয়ানক যাতনা হইতে লাগিল, তাহা বচনাতীত। ক্ষিপ্তার ন্যায় দুই হাতে চুল ছিঁড়িতে লাগিলাম, কাঁদিয়া ঘরের মেজে ভাসাইলাম, কত মাথা কুটিলাম, গালে মুখে চড়াইলাম, সজোরে বুকের উপর করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলাম। হায় হায়, আমি কেন মরিলাম না? কেন সেই পরমদেবতা অন্তর্দ্ধান হইতে না হইতে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে এ ছার প্রাণ ত্যাগ করিলাম না? আবার কেন বাঁচিলাম? কেন মরিলাম না? কিন্তু মরিলেই ত সব ফুরাইয়া গেল, পাপিনীর পাপের দণ্ড হইল কৈ? তাই বুঝি বিধাতা তত শীঘ্র এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে মৃত্যু লিখিলেন না!

আমি নষ্টবুদ্ধি, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ লইয়া ভুলিয়াছিলাম, পবিত্র গঙ্গা-জল ত্যাগ করিয়া পঙ্কিল কূপে ডুবিয়াছিলাম, দেবতার অনাদর করিয়া অসুরের পূজা করিয়াছিলাম—আমার শাস্তির এখনও হইয়াছে কি? হে অবলার গতি, ইহপরলোকের সারসর্ব্বস্ব! কোথায় তুমি? আমি মন্দভাগিনী তোমায় চিনিতে পারি নাই, তোমার অপার্থিব আদর উপেক্ষা করিয়াছি, সেই অসীম ভালবাসা তাচ্ছিল্য করিয়াছি, পিশাচিনী আমি,—দেবতার মহিমা কি বুঝিব? অতি সংকীর্ণ এই প্রাণ, তোমার সেই অগাধ অপরিমেয় প্রেমপারাবারের স্থান ইহাতে হইবে কেন? কলঙ্ককালিমায় এ হৃদয় পরিপূর্ণ, তোমার সেই স্নেহপ্রফুল্ল পবিত্র হাসির পবিত্র ছায়া ইহাতে প্রতিফলিত হইবে কেমন করিয়া? হে দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময়—তুমি ত দাসীর প্রতি কখনও নিদয় হও নাই। দয়া করিয়া আর একবার আসিয়া দেখা দাও। আর একবার তোমায় দেখিতে দেখিতে তোমার সেই দুর্লভ চরণ-প্রান্তে মাথা রাখিয়া এই পাপজীবন বিসর্জ্জন করি।

কাঁদিয়া মেজে ভিজাইলাম, কিন্তু তবু হৃদয়ে শান্তি পাইলাম না। যত কাঁদি—ততই সেই সব পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে, আর থাকিয়া থাকিয়া অচিরদৃষ্ট তাঁহার সেই উন্মাদমূর্ত্তি সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ মূর্ত্তি কি আমারই জন্য? কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! সেই শ্রী কি হইয়াছে! সেই সমুন্নত দেহযষ্টি ভাঙ্গিয়া কুব্জভাব ধারণ করিয়াছে! সেই ভূয়িষ্ঠবলসমন্বিত বপু অস্থিমাত্রসার হইয়াছে! সেই চিরহাস্য-প্রদীপ্ত অধরযুগল রক্তহীন হইয়া কি ভীষণ দেখাইতেছে! এই অল্পদিনে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! চোক বসিয়া গিয়াছে, কপাল কোঁকড়াইয়া আসিয়াছে, গাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখের কাথ বাহির হইয়া উঠিয়াছে—সেই সুরূপ কান্তিবিশিষ্ট লাবণ্যোজ্জ্বল অবয়ব দাবদগ্ধ নবতরুর ন্যায়